সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	**আস সুনান লিল ইমাম আবি দাউদ (প্রথম পত্র)**	০৩
২.	আস সুনান লিল ইমাম আত তিরমিযি ওয়াশ শামায়িল লিল ইমাম আত তিরমিযি (দ্বিতীয় পত্র)	০৬
৩.	আস সুনান লিল ইমাম ইবনি মাজাহ (তৃতীয় পত্র)	০৯
৪.	শরহু মাআনিল আছার লিল ইমাম আত তাহাভি (চতুর্থ পত্র)	১২
৫.	মুস্তালাহুল হাদিস ও মানাহিজুল মুহাদ্দিসীন (পঞ্চম পত্র)	১৫
৬.	আত তারিখুল ইসলামি ও তারিখু ইলমিল হাদিস (ষষ্ঠ পত্র)	১৮
৭.	দিরাসাতুত তাফসির ও উসুলিহি (সপ্তম পত্র)	২১
৮.	আল আকিদাহ আল ইসলামিয়্যাহ (অষ্টম পত্র)	২৪

বিষয় : ১. আস সুনান লিল ইমাম আবি দাউদ (প্রথম পত্র)
বিষয় কোড : 611101

এসাইনমেন্টের শিরোনাম : ইমাম আবু দাউদ (র) এর জীবন ও কর্ম।

শিক্ষার্থীর নাম	:	শিক্ষকের নাম	: .....
শ্রেণি	:	শিক্ষকের স্বাক্ষর	: .....
রেজি নং	:	পদবি	: .....
রোল নং	:	তারিখ	: .....
বিভাগ	:	মূল্যায়ন	: .....
সেশন	:		
পরীক্ষার বছর	:		
পর্ব	:		

সমাধান : ভূমিকা : ইসলামের জ্ঞানের দীপশিখা হিসেবে ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল রঙে অঙ্কিত ইমাম আবু দাউদ (র) ছিলেন একজন সেই পরাকাষ্ঠা মুহাদ্দিস। যিনি সত্য ও তত্ত্বের অনুসন্ধানে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তার জন্ম ও শৈশব থেকেই ধর্মীয় গবেষণার প্রতি গভীর আগ্রহ এবং জ্ঞানার্জনের প্রতি অসীম আকাঙ্ক্ষা ছিল। জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে তিনি মানবজাতির কল্যাণে হাদিস সংগ্রহ, যাচাই ও বণ্টনে অটুট অধ্যবসায় দেখিয়েছিলেন। নিচে ইমাম আবু দাউদ (র) এর জীবন ও কর্ম উপস্থাপন করা হলো।

ইমাম আবু দাউদ (র)-এর জীবনচরিত

নাম ও পরিচয় : নাম সোলায়মান, আবু দাউদ তাঁর উপনাম। পিতার নাম আশয়াস; তিনিও বিশিষ্ট হাদিস বিশারদ ছিলেন।

বংশধারা : তাঁর বংশধারা হচ্ছে আবু দাউদ সোলায়মান ইবনে আশয়াস ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আমর ইবনে আমের আস্ সিজিস্তানি। আবার কেউ কেউ তাঁর বংশধারা উল্লেখ করেছেন এভাবে আবু দাউদ সোলায়মান ইবনে আশয়াস ইবনে ইসহাক ইবনে বাশির ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আমর ইবনে ইমরান আল-ইযদী আস্-সিজিস্তানি।

জন্ম : ইমাম আবু দাউদ (র) ২০২ হিজরি মোতাবেক ৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে আফগানিস্তানের কান্দাহার ও চিশতের নিকটবর্তী সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। গোত্র পরিচয়ে তিনি ইযদ গোত্রের অন্তর্গত ছিলেন। ইবনে খাল্লান সিজিস্তানকে বসরার নিকটবর্তী এবং ইয়াকুত আল হামুভি এটিকে খোরাসানের নিকটবর্তী গ্রাম বলে উল্লেখ করেছেন।

শিক্ষজীবন : তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে তেমন কিছু জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে তিনি নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। দশ বছর বয়সে নিশাপুরের এক মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আসলামের কাছে হাদিসশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

শিক্ষা ভ্রমণ : হাদিসশাস্ত্রের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং গভীর জ্ঞান অর্জনের অদম্য বাসনা নিয়ে তিনি মিসর, সিরিয়া, হিজায, ইরাক, খোরাসানসহ তৎকালীন বিভিন্ন হাদিস শিক্ষার প্রসিদ্ধ নগরগুলো ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং সুবিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেছেন।

শিক্ষকবৃন্দ : ইমাম আবু দাউদ (র) এর শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, উসমান ইবনে আবু শায়বা, কুতাইবা ইবনে সাঈদ, আবুল ওয়ালিদ তায়ালিসি, মুহাম্মদ ইবনে কাসীর আল-আবদি, মুসলিম ইবনে ইবরাহিম, সোলায়মান ইবনে আবদুর রহমান দামেশকি ও আবু জাফর নুফাইলি প্রমুখ।

কর্মজীবন : ইমাম আবু দাউদ (র) শিক্ষাজীবন শেষ করে হাদিসের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করেন। হাদিসশাস্ত্রের গবেষণায় সারা জীবন কাটিয়ে দেন।

ছাত্রবৃন্দ : হাদিসশাস্ত্রের গবেষণায় যারা তাঁর থেকে শিক্ষালাভ করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত্ তিরমিযি, ইমাম আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শোয়াইব আন-নাসায়ী, আবু উসামা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মালেক, আবু সাঈদ ইবনে আরাবি প্রমুখ।

হাদিসশাস্ত্রে তাঁর অবদান : ইমাম হিকাম (র) বলেন– كَانَ اَبُوْ دَاوٗ دَ اِمَامَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ فِىْ عَصْرِهٖ بِلَا مُدَافَعَةٍ.
অর্থাৎ, ইমাম আবু দাউদ (র) ছিলেন তাঁর সময়ের অ-প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস।
হাদিসশাস্ত্রে ইমাম আবু দাউদ (র) এর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে, 'সুনানে আবু দাউদ' যা সিহাহ সিত্তার অন্যতম। তিনি পাঁচ লক্ষ হাদিস থেকে বাছাই করে চার হাজার আটশত হাদিস নিয়ে গ্রন্থটি সংকলন করেন। যার অধিকাংশ হাদিসসমূহ আহকাম

সম্পর্কিত। তিনি গ্রন্থটি ফিকাহশাস্ত্র অনুযায়ী সাজিয়েছেন। ইমাম বুখারির পর তিনিই ফিকহশাস্ত্র সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। যার কারণে গ্রন্থটিকে ফিকহ শাস্ত্রবিদগণ প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন, "একজন মুজতাহিদের পক্ষে মাসয়ালা বের করার জন্য সুনানে আবু দাউদ-ই যথেষ্ট।"
মুহাদ্দিস যাকারিয়া সাজি (র) বলেন, "ইসলামের মূলমন্ত্র কিতাবুল্লাহ এবং প্রামাণ্য দলিল সুনানে আবু দাউদ।"

রচনাবলি : ইমাম আবু দাউদ (র) রচিত গ্রন্থাবলির প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলো হলো–

١. اَلسُّنَنُ ٢. كِتَابُ الْمَرَاسِيْلِ ٣. دَلاَئِلُ النُّبُوَّةِ ٤. كِتَابُ الْبَعْثِ وَ النُّشُوْرِ ٥. كِتَابُ التَّفْسِيْرِ ٦. كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْاٰنِ ٧. كِتَابُ بَدْئِ الْوَحْيِ ٨. كِتَابُ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوْخِ ٩. كِتَابُ فَضَائِلِ الْاَنْصَارِ ١٠. كِتَابُ الرَّدِّ عَلٰى اَهْلِ الْقَدْرِيَّةِ.

মাযহাব : নওয়াব সিদ্দিক হাসানের মতে, তিনি শাফেয়ি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। আবু ইসহাক সিরাজি, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া প্রমুখের মতে, তিনি হাম্বলি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।
কেউ কেউ আবার হানাফি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।
প্রকৃত অর্থে তিনি নিজেই মুজতাহিদ ছিলেন। তাই তাঁর জন্য মাযহাব অনুকরণ আবশ্যক ছিল না।

ইন্তিকাল : হাদিসশাস্ত্রের এই মহান ব্যক্তিত্ব ২৭৫ হিজরি সালের ১৬ই শাওয়াল ৭৩ বছর বয়সে বসরা নগরীতে চির নিদ্রায় শায়িত হন। তাঁর ইন্তিকালের দিনটি ছিল জুমাবার।

সুনানে আবু দাউদের বৈশিষ্ট্যসমূহ : সুনানে আবু দাউদ স্বীয় বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল একটি হাদিস গ্রন্থ। এর প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচনা করা হলো–

১. **সুনান গ্রন্থ :** এটি সিহাহ সিত্তার অন্যতম এবং সুনান পর্যায়ের একটি গ্রন্থ। যেখানে মানবজীবনের শরিয়তের হুকুম আহকামগুলো আলোচনা করা হয়েছে।

২. **সহিহ হওয়ার সর্বোচ্চ নিশ্চয়তা :** ইমাম আবু দাউদ (র) হাদিস সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনেক বেশি যাচাই বাচাই নিশ্চিত করেছেন। তিনি পাঁচ লক্ষ হাদিস থেকে মাত্র চার হাজার আটশত হাদিস গ্রন্থটিতে সংকলন করেছেন। যার ফলে সহিহ হওয়ার নিশ্চয়তা সর্বাধিক।
এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন,كَتَبْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) خَمْسَ مِائَةِ اَلْفِ حَدِيْثٍ اِنْتَخَبْتُ مِنْهَا مَا ضَمَّنْتُهُ هٰذَا الْكِتَابَ.
অর্থাৎ, আমি মহানবী (স)-এর পাঁচ লক্ষ হাদিস লিপিবদ্ধ করেছি তার থেকে এ গ্রন্থে নির্বাচিত হাদিসগুলো সংকলিত করেছি।

৩. **দলিল উপস্থাপন :** সুনানে আবু দাউদ মাসায়ালা বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমামগণের মতামতসহ আলোচনা করেছেন। ফলে ফকিহগণের এরূপ মন্তব্যের মাধ্যমে মানগত ভিত্তি সু-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে– اِنَّهَا تَكْفِى الْمُجْتَهِدُ بَعْدَ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى
অর্থাৎ, একজন মুজতাহিদের জন্য কিতাবুল্লাহর পর সুনানে আবু দাউদ-ই যথেষ্ট।

৪. **সুলাসিয়াত সন্নিবেশ :** সাহাবি থেকে ইমাম দাউদ (র) পর্যন্ত তিন রাবি বিশিষ্ট অনেক হাদিস এ কিতাবে স্থান পাওয়ায় কিতাবের মর্যাদা আরো বেড়ে গিয়েছে।

৫. **শিরোনাম স্থাপন :** সুনানে আবু দাউদে সন্নিবেশিত হাদিসসমূহ প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে সংকলিত হয়েছে।

৬. **মন্তব্য পেশ :** মন্তব্য পেশ করা সুনানে আবু দাউদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যে সকল হাদিসের সনদ অথবা মতনে আপত্তিকর কোনো বিষয় পরিলক্ষিত হয়েছে যেখানে তিনি قَالَ اَبُوْ دَاوٗ دَ বলে মন্তব্য করেছেন।

৭. **সর্বজনগ্রাহ্য হাদিসের সংকলন :** ইমাম আবু দাউদ (র) হাদিস সংকলনের ব্যাপারে বলেছেন, مَا ذَكَرْتُ فِىْ كِتَابِىْ حَدِيْثًا اِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلٰى تَرْكِهٖ অর্থাৎ, সর্বজন পরিত্যক্ত কোনো হাদিস আমি এই কিতাবে লিপিবদ্ধ করিনি।

৮. **বিশেষ শব্দের প্রাধান্য :** সুনানে আবু দাউদে রেওয়াতের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী শব্দগুলো প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন حَدَّثنا বা عَنْعَنَة ইত্যাদি শব্দগুলো বেশি ব্যবহার করা হয়েছে।

৯. **বিশেষ বৈশিষ্ট্য :** ইমাম আবু জাফর ইবনে যোবায়ের (র) বলেন,
لِاَبِىْ دَاوٗدَ حَصَرَ اَحَادِيْثَ الْاَحْكَامِ وَاسْتَيْعَابِهَا مَا لَيْسَ فِىْ غَيْرِهٖ.
অর্থাৎ, সুনানে আবু দাউদে হাদিসগুলো নিরঙ্কুশ সংকলনের কারণে যে বিশেষত্ব এই গ্রন্থে রয়েছে তা অন্য কোনো গ্রন্থে নেই।

১০. **দালিলিক প্রমাণ :** সুনানে আবু দাউদে শরিয়তের বিধানগুলো এবং প্রামাণ্য দলিলগুলোর বিশেষায়নের কারণে সুনানে আবু দাউদ ইসলামের দলিল গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুহাদ্দিস আল্লামা যাকারিয়া সাজি বলেন,
كِتَابُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَصْلُ الْاِسْلَامِ وَكِتَابُ السُّنَنِ لِاَبِىْ دَاوٗدَ عَهْدُ الْاِسْلَامِ.
অর্থাৎ, কিতাবুল্লাহ হচ্ছে ইসলামের মূলগ্রন্থ আর সুনানে আবু দাউদ হলো দলিল গ্রন্থ।

১১. **দুর্বল ও অজ্ঞাতনামা রাবীর হাদিস বর্ণনা :** ইমাম আবু দাউদ (র) সহিহ হাদিসের সন্ধান পেতে দুর্বল এবং অজ্ঞাতনামা রাবির হাদিসও সুনানে আবু দাউদে সংকলন করেছেন।

১২. **হাদিস সংক্ষিপ্তকরণ :** সুনানে আবু দাউদে পাঠকদের বুঝার সুবিধার্থে হাদিস সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আবু দাউদ (র) বলেন, "কখনো আমি দীর্ঘ হাদিস সংক্ষিপ্ত করেছি। যদি তা না করতাম তাহলে পাঠক বুঝতে সম্মত হতো না এবং এতে ফিকহের অবস্থান বুঝতে পারত না।

১৩. মতন সুবিন্যস্তকরণ : এই গ্রন্থে একই অর্থবোধক একাধিক মতন এমনভাবে সু-বিন্যস্ত করা হয়েছে যাতে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়। এককথায়, সুনানে আবু দাউদ মতন সুবিন্যস্ত একটি কিতাব।

১৪. রাবি সংশোধন : কোনো হাদিসের রাবি উপনাম বা উপাধি অস্পষ্ট থাকলে সুনানে আবু দাউদে তা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫. প্রাধান্য : সুনানে আবু দাউদে সহিহ হাদিসগুলোকে দুর্বল হাদিসগুলোর ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

مَنْزِلَةُ سُنَنِ اَبِىْ دَاؤدَ **(সুনানে আবু দাউদের অবস্থান) :** বিখ্যাত হাদিসগ্রন্থ ও সুনান গ্রন্থসমূহের মধ্যে ইমাম আবু দাউদ (র)-এর সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থটি অন্যতম। হিজরি তৃতীয় শতকে সংকলিত যেসব হাদিসগ্রন্থ সর্বাধিক সমাদৃত, সুনানে আবু দাউদ তন্মধ্যে কতিপয় কারণে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। এ শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হচ্ছে–

১. সহিহ হওয়ার দিক দিয়ে সুনানে আবু দাউদের অবস্থান চতুর্থ পর্যায়ে হলেও ফিকহি বিন্যাসের ক্ষেত্রে হাদিসের গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্য কোনো গ্রন্থ এর সমপর্যায়ের নয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু জাফর ইবনে যোবায়ের (র) বলেন– لِاَبِىْ دَاؤدَ حَصَرَ اَحادِيْثَ الْاَحْكَامِ وَاِسْتَيْعَابِهَا مَا لَيْسَ فِىْ غَيْرِهِ অর্থাৎ, ফিকহি বিধানাবলি সম্পর্কিত হাদিসসমূহ সামগ্রিক ও নিরঙ্কুশভাবে সংকলিত হওয়ার কারণে সুনানে আবু দাউদের যে বিশেষত্ব, তা অন্য কোনো হাদিসগ্রন্থের নেই।

২. হাদিস গ্রন্থসমূহের মধ্যে ব্যবহারিক গুরুত্ব ও মূল্যায়ন সুনানে আবু দাউদেরই বেশি। এ প্রসঙ্গে ইমাম গাযালি (র) বলেন, হাদিসের মধ্যে এ গ্রন্থটি মুজতাহিদের জন্য যথেষ্ট।

৩. মুহাদ্দিস যাকারিয়া সাজি (র) বলেন– كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اَصْلُ الْاِسْلَامِ وَكِتَابُ السُّنَنِ لِاَبِىْ دَاؤدَ عَهْدُ الْاِسْلَامِ.
অর্থাৎ, ইসলামের মূল হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, আর ইসলামের সামগ্রিক শিক্ষা হচ্ছে ইমাম আবু দাউদের সুনান গ্রন্থটি।

৪. সুনানে আবু দাউদকে আল্লাহ তাআলা এত বেশি জনপ্রিয়তা দিয়েছেন, যা সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো হাদিসগ্রন্থকে দেননি। এদিকে ইঙ্গিত করে ইমাম আবু দাউদ (র)-এর ছাত্র হাফেয মুহাম্মদ মাখালাম ইবনে দুয়ারি বলেছেন–
لَمَّا صَنَّفَ السُّنَنَ وَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ صَارَ كِتَابُهُ كَالْمَصْحَفِ يُتْبَعُوْنَهُ.
অর্থাৎ, ইমাম আবু দাউদ (র) যখন সুনানগ্রন্থটি প্রণয়ন করলেন এবং তা লোকদেরকে পাঠ করে শুনালেন, তখন তা মুহাদ্দিসগণের নিকট কুরআন মাজিদের মতোই অনুসরণীয় পবিত্র গ্রন্থ হয়ে গেল।

৫. ইমাম আবু দাউদ (র) পাঁচ লক্ষ হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই করে মাত্র চার হাজার আটশ সহিহ হাদিসের মাধ্যমে এ গ্রন্থ সংকলন করেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু দাউদ নিজেই বলেন– كَتَبْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ مِائَةِ اَلْفِ حَدِيْثٍ اِنْتَخَبْتُ مِنْهَا مَا ضَمَّنْتُهُ هٰذَا الْكِتَابَ.
অর্থাৎ, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পাঁচ লক্ষ হাদিস লিপিবদ্ধ করেছিলাম। তন্মধ্যে হতে যাচাইবাছাই করে মনোনীত হাদিস এ গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছি।

৬. সুনানে আবু দাউদে মাসয়ালার ক্ষেত্রে ইমাগণের মতামতের আলোকে পেশকৃত দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে এর মানগত ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুনানে আবু দাউদ সম্পর্কে ফকিহগণের মন্তব্য হলো–اِنَّهَا تَكْفِى الْمُجْتَهِدُ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ تَعَالٰى অর্থাৎ, "একজন মুজতাহিদের পক্ষে ফিকহের মাসয়ালা বের করার জন্য আল্লাহর কিতাব কুরআনের পরে এ সুনানে আবু দাউদই যথেষ্ট।"

৭. সুনানে আবু দাউদে তিন রাবীবিশিষ্ট অনেক 'সুলাসিয়াত' হাদিস স্থান পেয়েছে, যা এর মর্যাদাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

৮. ইমাম আবু দাউদ (র) তাঁর হাদিসগ্রন্থে সন্নিবেশিত হাদিসসমূহ ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে উপস্থাপন করেছেন।

৯. মন্তব্য পেশ করা সুনানে আবু দাউদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রয়োজনানুসারে কোনো হাদিসের ব্যাপারে মন্তব্য পেশ করেছেন।

১০. বিপুল গ্রহণযোগ্যতার কারণে সুনানে আবু দাউদ সর্বজনীন হাদিস সংকলনের মর্যাদা অর্জন করেছে। এ সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন– مَا ذَكَرْتُ فِىْ كِتَابِىْ حَدِيْثًا أَجْتَمَعَ النَّاسُ عَلٰى تَرْكِهِ অর্থাৎ, "জনগণ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে পরিত্যক্ত কোনো হাদিসই আমি আমার এ কিতাবে উল্লেখ করিনি।"

সমাপনী : সুনানে আবু দাউদ শরিফ হাদিসের সুবিশাল পরিমণ্ডলে একটি অতি পরিচিত নাম। বিশেষ করে সিহাহ সিত্তার মধ্যে এর অবস্থান উল্লেখযোগ্য। বিশুদ্ধতার দিক থেকে বুখারি ও মুসলিম শরীফের পরেই এর অবস্থান। কিন্তু সুনান গ্রন্থসমূহের মাঝে এটি সর্বোচ্চ। বিশুদ্ধতা ও ফিকহি বিন্যাসের কারণেই গ্রন্থটি আজও শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বিদ্যমান।

বিষয় : আস সুনান লিল ইমাম আত তিরমিযি ওয়াশ শামায়িল লিল ইমাম আত তিরমিযি (দ্বিতীয় পত্র)

বিষয় কোড : 611102

এসাইনমেন্টের শিরোনাম : ইমাম তিরমিযি (র) এর জীবনী ও সুনানু তিরমিযির বৈশিষ্ট্য।

শিক্ষার্থীর নাম	:	শিক্ষকের নাম	: .....
শ্রেণি	:	শিক্ষকের স্বাক্ষর	: .....
রেজি নং	:	পদবি	: .....
রোল নং	:	তারিখ	: .....
বিভাগ	:	মূল্যায়ন	: .....
সেশন	:		
পরীক্ষার বছর	:		
পর্ব	:		

সমাধান : ভূমিকা : রাসূলুল্লাহ (স) এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী যারা সংকলন করেছেন তন্মধ্যে ইমাম তিরমিযি (র) অন্যতম। তিনি সুনানুত তিরমিযি হাদিসগ্রন্থ সংকলন করে সমগ্রবিশ্বে সমাদৃত। যার রচনাশৈলী সংযোজন ও সজ্জায়ন অতি চমৎকার। নিচে প্রশ্নালোকে এ ক্ষণজন্মা মহামনীষীর জীবনবৃত্তান্ত ও তার রচিত গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরা হলো।

ইমাম তিরমিযি (র) এর জীবনী

১. **নাম ও পরিচয় :** তার নাম মুহাম্মাদ, উপনাম আবু ঈসা, নিসবতি নাম তিরমিযি। পিতার নাম ঈসা। তিনি একজন যুগশ্রেষ্ঠ হাদিসবিশারদ।

২. **নসবনামা :** তার নসবনামা হচ্ছে, আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা ইবনে সুরাহ ইবনে মুসা ইবনে যাহহাক আস সুলামি আল বুগি আত তিরমিযি।

৩. **জন্মগ্রহণ :** তিনি বলখের আমুদরিয়া নদীর তীরে অবস্থিত তিরমিয শহরের বগু নামক অঞ্চলে হিজরি ২০৯ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্বপুরুষগণ ছিলেন মার্ভ এর অধিবাসী, তার দাদা লাইস ইবনে সাইয়ারের আমলে সেখান থেকে তিরমিযে এসে বসতি স্থাপন করেন। সে স্থানের দিকে সম্বন্ধ করেই তাঁকে তিরমিযি বলা হয়।

৪. **শিক্ষাজীবন :** তিনি প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামেই অর্জন করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি ইলমে হাদিস ও ইলমে ফিকহ বিষয়ে জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করেন। তাই হাদিস ও ফিকহশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ হাদিসবিশারদ ও ফিকহবিদগণের শরণাপন্ন হন। এ পর্যায়ে তিনি সে যুগে আবির্ভূত যুগান্তকারী মুহাদ্দিস ইমাম বুখারি, মুসলিম ও আবু দাউদ (র) এর নিকট থেকে হাদিসের জ্ঞানলাভ করে স্বীয় জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করেন।

৫. **হাদিস সংগ্রহে বিদেশ সফর :** ইমাম তিরমিযি (র) বাল্যকাল থেকেই হাদিসের জ্ঞান আহরণের প্রতি অতি উৎসাহী ছিলেন। তাই নিজ এলাকার মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদিস সংগ্রহ শেষে তিনি আরো হাদিস সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন দেশ সফর করেন। এ পর্যায়ে তিনি বসরা, কুফা, ওয়াসিত, রায়, খোরাসান ও হিজাযে হাদিসের সন্ধানে গমন করেন। ঐ সব দেশের বড় বড় মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে তিনি হাদিস সংগ্রহ করেন। হাদিস সংগ্রহে তার সফরের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি (র) বলেন, طَافَ الْبِلَادَ وَسَمِعَ خَلْقًا مِنَ الْخُرَاسَانِيِّيْنَ وَالْعِرَاقِيِّيْنَ وَالْحِجَازِيِّيْنَ.

৬. **শিক্ষকবৃন্দ :** ইমাম তিরমিযি (র) স্বীয় যুগের অগণিত হাদিসবিশারদ থেকে হাদিসের জ্ঞানলাভ করেছেন। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন ইমাম বুখারি (র), মুসলিম (র), আলি ইবনে হাজার মারুযি (র), হানায ইবনে সারি (র), কুতাইবা ইবনে সাঈদ (র), মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার (র), আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনে সাঈদ জাওহারি (র), বাশার ইবনে আদম (র), জারুদ ইবনে মুয়ায (র), হাতেম ইবনে সাবাহ (র), রাজা ইবনে মুহাম্মাদ (র), দিয়াদ ইবনে আইয়ুব (র), সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান (র), সালেহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান (র), আব্বাস ইবনে আবদুল আযিম (র), ফযল ইবনে সাহল (র), মুহাম্মাদ ইবনে আবান ইবনে ওযির (র), নসর ইবনে আলি (র), হারুন ইবনে আবদুল্লাহ (র), ইয়াহইয়া ইবনে আকসার (র) প্রমুখ। তিনি স্বীয় সুনানুত তিরমিযিতে যেসব শিক্ষক থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন তাদের সংখ্যা ২০৬ জন। তাদের ৪১ জন কুফার অধিবাসী।

৭. **ছাত্রবৃন্দ :** ইমাম বুখারি (র) এর পর জ্ঞানে, মেধায়, বুযুর্গি ও পরহেযগারিতে ইমাম তিরমিযি (র) এর সমকক্ষ কোনো মুহাদ্দিস ছিলেন না। সমগ্র পৃথিবীতে তার অসংখ্য সুযোগ্য ছাত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তার জগদ্বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন, ১. আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ মারুযি (র), ২. হাইসাম ইবনে কুলাইব শামি (র), ৩. আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে মাহবুব মারুযি (র), ৪. আহমাদ ইবনে আবু ইউসুফ নাসাফি (র), ৫. আবদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ নাসাফি (র), ৬. মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ (র), ৭. দাউদ ইবনে সর ইবনে সাহল বাযদুভি (র) প্রমুখ।

৮. ইমাম বুখারি (র) কর্তৃক ইমাম তিরমিযি (র) থেকে হাদিস শ্রবণ : ইমাম তিরমিযি (র) ইমাম বুখারি (র) এর অন্যতম ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং ইমাম বুখারি (র) ইমাম তিরমিযি (র) এর নিকট হতে হাদিস শ্রবণ করেছেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ هَارُوْنَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ عُمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا. এর নিচে বর্ণিত হাদিস سُوْرَةُ الْحَشْرِ-এ اَبْوَابُ التَّفْسِيْرِ লিখে বলেছেন যে, আমার থেকে আমার উস্তাদ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল এ হাদিসটি শুনেছেন। আর اَبْوَابُ الْمَنَاقِبِ এর মধ্যে হাদিস يَا عَلِيُّ لَا يَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يَجْنُبَ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِيْ وَقَدْ سَمِعَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ مِنِّيْ هٰذَا الْحَدِيْثَ. প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, وَغَيْرُكَ

৯. মেধাশক্তি : আল্লাহ তাআলা যখন কারো থেকে কোনো কাজ নেওয়ার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তার মধ্যে সে যোগ্যতাও সৃষ্টি করেন। এ হিসেবে আল্লাহ তাআলা ইমাম তিরমিযি (র) এর মধ্যে বড় বড় হাদিসবিশারদগণ থেকে হাদিসের জ্ঞানলাভ করার মতো মেধা ও ধীশক্তিও দান করেছিলেন।

আল্লামা আবু সাঈদ আওরিসি (র) বলেন, ইমাম তিরমিযি (র) এর মেধাশক্তি ছিল প্রবাদস্বরূপ। একবার শ্রবণ করামাত্র তার মুখস্থ হয়ে যেত।

১০. আল্লাহভীতি : ইমাম তিরমিযি (র) তাকওয়া, আল্লাহভীতি, পরহেযগারিতে এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন, আল্লাহ তাআলার ভয়ে তিনি সর্বদা কান্নাকাটি করতেন এবং চোখ থেকে সর্বদা অশ্রু ঝরত। এমনকি ক্রন্দন করতে করতে তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গিয়েছিল।

১১. তার সম্পর্কে মনীষীগণের উক্তি : ইমাম তিরমিযি (র) একজন হাকেম, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বিশিষ্ট ফিকহবিদ, বুদ্ধিমান ও অদ্বিতীয় মুজতাহিদ ছিলেন।

ক. اَشِعَّةُ اللَّمَعَاتِ গ্রন্থকার বলেন اِنَّه كَانَ حَافِظًا عَادِلًا وَنَاقِدًا وَلَه يَدٌ طُوْلَى فِى الْفِقْهِ , অর্থাৎ, তিনি হাফেয, ন্যায়পরায়ণ, সমালোচক এবং ফিকহশাস্ত্রে প্রাজ্ঞ ছিলেন।

খ. আরফুশ শাযি গ্রন্থকার বলেন,اِنَّه كَانَ مِنْ جِبَالِ الْحَدِيْثِ وَلٰكِنَّ الْبُخَارِيَّ (رح) كَانَ شَمْسَ سَمَاءِ هٰذَا الْفَنِّ অর্থাৎ, তিনি ছিলেন হাদিসশাস্ত্রের পাহাড়তুল্য, তবে ইমাম বুখারি (র) ছিলেন এ বিষয়ে আকাশের সূর্যতুল্য।

গ. ইমাম বুখারি (র)ও তার প্রিয় ছাত্র ইমাম তিরমিযিকে নিয়ে গর্ব করতেন। তিনি তার শিক্ষক হয়েও তার সম্পর্কে বলেছেন, اِنْتَفَعْتُ بِكَ اَكْثَرَ مِمَّا انْتَفَعْتَ بِيْ অর্থাৎ, তুমি আমার দ্বারা যতটুকু উপকৃত হয়েছ আমি তোমার নিকট থেকে তার চেয়ে অধিক উপকৃত হয়েছি।

১২. হাদিসশাস্ত্রে তার অবদান : হাদিসশাস্ত্রে তার উল্লেখযোগ্য অবদান হলো 'সুনানুত তিরমিযি' রচনা। এটি অত্যন্ত মূল্যবান ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী হাদিসগ্রন্থ। হিজায ও ইরাকের উলামায়ে কিরাম এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেন। শায়খুল ইসলাম হারফি (র) বলেন, হাদিসশাস্ত্রের দৃষ্টিতে এ গ্রন্থ বুখারি ও মুসলিম শরিফ থেকে অধিক উপকারী। 'সুনানুত তিরমিযি' গভীরতা ও বিশুদ্ধতার দৃষ্টিতে বুখারি শরিফের পদ্ধতির বাহক। উপস্থাপনা ও শৃঙ্খলার দিক দিয়ে এটি সহিহ মুসলিম শরিফের অনুরূপ। আহকামের হাদিস ও ফকিহবৃন্দের প্রমাণাদির বর্ণনার দিক থেকে এটি সুনানু আবি দাউদের অনুরূপ। প্রয়োজনীয় সকল হাদিস এতে বিদ্যমান।

১৩. ইন্তিকাল : প্রসিদ্ধ বর্ণনানুযায়ী তিনি হিজরি ২৭৯ সনের ১৩ রজব মোতাবেক ৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে সোমবার তিরমিয থেকে ছয় ক্রোশ দূরে 'বুগ' নামক গ্রামে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

আল্লামা সাময়ানি (র) এর মতে, ইমাম তিরমিযি (র) ২৭৫ হিজরি সনে এবং শায়খ আবিদ সিন্ধি (র) এর মতে, ২৭৭ হিজরি সনে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ) : خَصَائِصُ كِتَابِ السُّنَنِ সুনানুত তিরমিযি সিহাহ সিত্তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ। ইমাম তিরমিযি (র) এ গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করার সময় হাদিসের দোষত্রুটির দিকগুলো উল্লেখ করেছেন। ফলে এ গ্রন্থটি অনুপম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যেমন–

১. সুনানুত তিরমিযির মধ্যে কোনো মাওযু বা জাল হাদিস নেই। এ গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবেশিত সমস্ত হাদিসের মধ্যে মাত্র দুটি হাদিস ব্যতীত অন্য সকল হাদিসের উপর উম্মতে মুহাম্মদিয়ার কেউ না কেউ 'আমল করেন।'

২. সুনানুত তিরমিযিতে একটি সুলাসি হাদিস রয়েছে।

৩. এ গ্রন্থে সাহাবি, তাবেয়ি এবং বিভিন্ন এলাকার ফিকহবিদগণের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে পাঠকগণ হাদিসের মূল বক্তব্য অনুধাবন করতে পারেন।

৪. এ গ্রন্থে প্রত্যেক হাদিস সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে যেমন, হাদিসটি সহিহ, হাসান, যয়িফ বা মুনকার। সাথে সাথে যয়িফ হওয়ার কারণও বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে পাঠক এর প্রতি দৃষ্টি দেয় এবং এর উপর ভিত্তি করে অন্যগুলো সঠিক কি না তা জানতে পারে। এতে কোনটা মুস্তাফিয ও কোনটা গরিব তাও বিবৃত হয়েছে। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে রজব তার শারহু ইলালুত তিরমিযি গ্রন্থে বলেন, ইমাম তিরমিযি (র) তার গ্রন্থে সহিহ, হাসান এবং গরিব হাদিস বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে কিছু 'মুনকার' হাদিসও রয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে তিনি হাদিসটি সহিহ, যয়িফ বলেও উল্লেখ করেছেন। আল্লামা হাযেমি (র) বলেন, যদি হাদিসটি যয়িফ হয় অথবা চতুর্থ তবকার হয় তবে তিনি হাদিসটি যয়িফ বলে সতর্ক করেছেন। এমতাবস্থায় রিওয়ায়াতটি পরিচ্ছেদে অবস্থিত সহিহ রিওয়ায়াতগুলোর মুতাবি ও শাহেদ হিসেবে গণ্য হয়েছে।

৫. এতে হাদিসসমূহের বর্ণনাকারীগণের নাম, উপাধি, উপনাম বর্ণনা করা হয়েছে।

৬. এ হাদিস গ্রন্থে পুনরুল্লিখিত হাদিসের সংখ্যা খুবই অল্প। ৮০টি মতান্তরে ৮৩টি হাদিস পুনরুল্লিখিত রয়েছে।

৭. সাধারণভাবে অধিকাংশ বাবে বিশেষ কোনো আহকামের বিষয়ে একটি হাদিস উল্লেখ করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। যে হাদিসের বহু সনদ অথবা একই বাবে অন্যান্য রিওয়ায়াতে রয়েছে, তার প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছেন। এজন্য এ গ্রন্থে আহকাম বিষয়ক হাদিসের সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু তার فِي الْبَابِ عَنْ فُلَانٍ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে একই বিষয়ের বহু রিওয়ায়াত এবং রিওয়ায়াতকারী সাহাবিগণের সংখ্যা অতি সহজে জানা যায়।

৮. এ গ্রন্থে ফিকহের আলোকে অধ্যায়সমূহ সাজানো হয়েছে। এতে ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ের হাদিসসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

৯. এ গ্রন্থে অনেক হাদিসকে সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে এবং হাদিসের দীর্ঘতা বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ অর্থাৎ হাদিসটি দীর্ঘ।

১০. বিশেষত সুনানুত তিরমিযি গ্রন্থটির ভাষা সাবলীল এবং এর অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ বিন্যাস পদ্ধতি খুবই সুন্দর।

جَرْحُ ও تَعْدِيْلُ এর ক্ষেত্রে তিরমিযি (র) এর অবস্থান : হাদিসের جَرْحُ ও تَعْدِيْلُ এর ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযি (র) এর অবস্থান শীর্ষে। বর্ণনাকারীর মধ্যে যেসব গুণ থাকলে তার হাদিস গ্রহণীয় হবে এবং যেসব দোষ থাকলে তার হাদিস পরিত্যাজ্য হবে সে ব্যাপারে ইমাম তিরমিযি (র) ছিলেন সুদক্ষ। হাদিসের جَرْحُ ও تَعْدِيْلُ এর ব্যাপারে তিনি উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তার প্রমাণ মেলে স্বয়ং তার সুনানুত তিরমিযি কিতাবে। তিনি হাদিসের শেষে সহিহ, হাসান, গরিব ইত্যাদি পরিভাষা উল্লেখ করেছেন। এতে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, তিনি হাদিসশাস্ত্রে جَرْح ও تَعْدِيْل এর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। অন্যথা এরূপ বলা সম্ভব নয়।

ইমাম তিরমিযি (র) এর রচনাবলি : তার অসংখ্য রচনা সম্ভার রয়েছে। তন্মধ্যে ইমাম তিরমিযি (র) এর দশটি কিতাব আজও তার স্মৃতির ধারক হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে।

১. سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ
২. كِتَابُ الشَّمَائِلِ الْمُحَمَّدِيَّةِ
৩. كِتَابُ الْعِلَلِ الصُّغْرٰى
৪. اَلْعِلَلُ الْكَبِيْرُ
৫. كِتَابُ التَّارِيْخِ
৬. اَلزُّهْدُ
৭. اَلْاَسْمَاءُ وَالْكُنٰى
৮. كِتَابُ التَّارِيْخِ
৯. كِتَابُ التَّفْسِيْرِ
১০. تَسْمِيَةُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) ইত্যাদি।
১১. كِتَابُ الْجَرْحِ وَ التَّعْدِيْلِ
১২. اَلرُّبَاعِيَّاتُ فِى الْحَدِيْثِ

ইমাম তিরমিযি (র) এর রচনাপদ্ধতি : ইমাম তিরমিযি (র) তার জামে ও সুনান হাদিসগ্রন্থটি সংকলনের ক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতির অনুসরণ করেন, তা হলো–

১. ইমাম তিরমিযি (র) স্বীয় সুনানুত তিরমিযি কিতাবকে ৪৬টি পর্বে ভাগ করেন। এক্ষেত্রে اَبْوَابُ الطَّهَارَةِ দ্বারা স্বীয় গ্রন্থ শুরু করেন এবং اَبْوَابُ الْمَنَاقِبِ দ্বারা তা সমাপ্ত করেন।
২. তিনি এ কিতাবটিকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করেন।
৩. তিনি প্রতিটি বাবের শিরোনাম সংযোজন করেছেন।
৪. ইমাম তিরমিযি রাবি সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি উল্লেখ করেছেন।
৫. তিনি হাদিসের শ্রেণি বিশ্লেষণ করেছেন।
৬. তিনি ফুকাহায়ে কিরামের মাযহাব বর্ণনা করেছেন।
৭. তিনি রাবির দোষ-গুণ বর্ণনা করেছেন।
৮. তিনি স্বীয় কিতাবে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করেছেন এবং তার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন।
৯. তিনি স্বীয় কিতাবটি ফিকহি তারতিব অনুযায়ী বিন্যাস করেছেন।

বিষয় : আস সুনান লিল ইমাম ইবনি মাজাহ (তৃতীয় পত্র)

কোর্স: 611103

এসাইনমেন্টের শিরোনাম : ইমাম ইবনে মাজাহ (র) এর জীবনী।

শিক্ষার্থীর নাম	:	শিক্ষকের নাম	: .....
শ্রেণি	:	শিক্ষকের স্বাক্ষর	: .....
রেজি নং	:	পদবি	: .....
রোল নং	:	তারিখ	: .....
বিভাগ	:	মূল্যায়ন	: .....
সেশন	:		
পরীক্ষার বছর	:		
পর্ব	:		

সমাধান : ভূমিকা : হাদিস সংকলনের স্বর্ণযুগ হিজরি তৃতীয় শতকে কুতুবুস সিত্তার সবগুলো গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। কুতুবুস সিত্তার অন্যতম একটি গ্রন্থ হলো 'সুনানু ইবনে মাজাহ'। নিচে লেখকের জীবনী উল্লেখপূর্বক সুনানু ইবনে মাজাহ প্রণয়নপদ্ধতি উল্লেখ করা হলো–

حَيَاةُ الْإِمَامِ اِبْنِ مَاجَة **(ইমাম ইবনে মাজাহ র.-এর জীবনী) :**

১. **নাম ও পরিচিতি :** ইমাম ইবনে মাজাহ (র)-এর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। পিতার নাম ইয়াযিদ, উপনাম আবু আবদুল্লাহ, উপাধি আল-হাফিযুল কাবির, নিসবতি নাম রাবাঈ, আল- কাযভিনি। তিনি ইবনে মাজাহ নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁর পুরো বংশপরিক্রমা নিচে উল্লেখ করা হলো।

اَلْحَافِظُ الْكَبِيْرُ الْمُفَسِّرُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَاجَةَ الرَّبْعِيُّ اَلْقَزْوِيْنِيُّ.

২. **জন্মগ্রহণ :** তিনি ২০৯ হিজরি মোতাবেক ৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের প্রসিদ্ধ শহর কাযভিনে জন্মগ্রহণ করেন। মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান বিন আফফান (রা)-এর খেলাফতকালে এ শহরটি বিজিত হয়। এ শহরের প্রথম গভর্নর বা প্রশাসক ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবি বারা ইবনে আযেব (রা)।

৩. **শিক্ষাজীবন :** ইমাম ইবনে মাজাহ (র) নিজ দেশেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেন। এরপর তিনি কুরআন কারিম হিফয করেন। অতঃপর উচ্চশিক্ষা অর্জন এবং হাদিস সংগ্রহের জন্য তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ ও জনপদের যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের দ্বারস্থ হন।

৪. **হাদিস সংগ্রহে ভ্রমণ :** ইমাম ইবনে মাজাহ ২৩০ হিজরি মোতাবেক ৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ২২ বছর বয়সে হাদিস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শহরের মুহাদ্দিসগণের নিকট গমন করেন। আল্লামা আবু যুরআ 'আল হাদিস ওয়াল মুহাদ্দিসুন' গ্রন্থে লিখেছেন,

وَارْتَحَلَ لِكِتَابَةِ الْحَدِيْثِ وَتَحْصِيْلِهِ إِلَى الرَّيِّ، وَالْبَصْرَةِ وَالْكُوْفَةِ وَبَغْدَادَ، وَإِلَى الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْحِجَازِ، وَأَخَذَ الْحَدِيْثَ عَنْ كَثِيْرٍ مِنْ شُيُوْخِ الْأَمْصَارِ

অর্থাৎ, ইমাম ইবনে মাজাহ (র) হাদিস লিপিবদ্ধকরণ এবং শিক্ষার্জনের জন্য রায়, বসরা, কূফা, বাগদাদ, সিরিয়া, মিসর, হেজায প্রভৃতি দেশ ও জনপদে ভ্রমণ করেন এবং বহু মনীষীর নিকট থেকে হাদিস সংগ্রহ করেন।

ইবনে হাজার আসকালানি (র) বলেন,

سَمِعَ بِخُرَاسَانَ وَالْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ وَمِصْرَ وَ الشَّامِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ

তিনি খোরাসান, ইরাক, হেজায, মিসর, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের মনীষীদের নিকট থেকে হাদিস শুনেছেন।

হাদিস সংগ্রহের জন্য কষ্টকর দেশ ভ্রমণের পরে তিনি ১৫ বছরের অধিক ইলম চর্চায় নিমগ্ন থাকেন।

৫. **শিক্ষকমণ্ডলী :** ইবনে মাজাহ (র) দেশ-বিদেশের অনেক মনিষীর নিকট শিক্ষাগ্রহণ ও হাদিস সংগ্রহ করেছেন। তাঁর অসংখ্য ওস্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, হাফেয আলি ইবনে মুহাম্মাদ আত তানাফিসি, জুররাহ ইবনুল মাগাল্লিস, মুসয়াব ইবনে আবদুল্লাহ আয যুবাইরি, সুয়াইদ ইবনে সাঈদ, আবদুল্লাহ ইবনে মুআবিয়া আল-জুমাহি, মুহাম্মাদ ইবনে রুমহ, ইবরাহিম ইবনুল মুনযির আল হিফমি, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর, আবু বকর ইবনে আবু শায়বা, হিশাম ইবনে আম্মার, ইয়াযিদ ইবনে আবদুল্লাহ ইয়ামামি, আবু মুসআব আয-যুহরি, বিশর ইবনে মুআয, আল আকাদি, হুমাইদ ইবনে মাসয়াদা, আবু হুযায়ফা

আস সাহমি, দাউদ ইবনে রুশাইদ, আবু খায়ছামা, আবদুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান আল মুকবেরি, আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে বাররাদ, আবু সাঈদ, আল আমাযা, আবদুর রহমান ইবনে ইবরাহিম দুহাইম, আবদুস সালাম ইবনে আছেম আল হিসিনজারি, ওসমান ইবনে আবু শায়বা (র) প্রমুখ।

বহু মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদিস শিক্ষাগ্রহণ ও সংগ্রহ করলেও ইমাম ইবনে মাজাহ (র) তাঁর সবচেয়ে প্রিয়তম ওস্তাদ আবু বকর ইবনে আবি শায়বার নিকট থেকে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছেন।

৬. **ছাত্রবৃন্দ :** ইমাম ইবনে মাজাহ (র)-এর অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ইবরাহিম ইবনে দিনার আল হাওশাবি, আহমাদ ইবনে ইবরাহিম আল কাযভিনি (তিনি হাফেয আবু ইয়ালা আল খলিলির দাদা), আবুত তাইয়েব আহমাদ ইবনে রাওহিন আল বাগদাদি আশ শারানি, আবু আমর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাকিম আল মাদিনি আল ইস্পাহানি, ইসহাক ইবনে মুহাম্মাদ আল কাযভিনি, জাফর ইবনে ইদরিস, হোসাইন ইবনে আলী ইবনে ইয়াযদানিয়ার, সুলায়মান ইবনে ইয়াযিদ আল কাযভিনি, আলি ইবনে সাঈদ ইবনে আবদুল্লাহ আল আসকারি, মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আছ-ছাফফার প্রমুখ।

৭. **সুনানু ইবনে মাজাহ সংকলন :** ইমাম ইবনে মাজাহ (র)-এর দীর্ঘদিনের কঠোর সাধনা ও অধ্যবসায়ের ফসল সুনানু ইবনে মাজাহ। এটি কুতুবুস সিত্তার অন্যতম গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি সংকলন শেষে ইমাম ইবনে মাজাহ (র) তাঁর বিখ্যাত ওস্তাদ ইমাম আবু যুরআ আর-রাযির নিকট পেশ করলে তিনি চুলচেরা বিশ্লেষণপূর্বক একে ইলমে হাদিসের এক অনন্য সাধারণ ও উপকারী গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এ সম্পর্কে ইমাম ইবনে মাজাহ (র) বলেন,

عَرَضْتُ هٰذِهِ السُّنَنَ عَلَى أَبِيْ زُرْعَةَ فَنَظَرَ فِيْهِ، وَقَالَ : أَظُنُّ إِنْ وَقَعَ هٰذَا فِيْ أَيْدِي النَّاسِ تَعَطَّلَتْ هٰذِهِ الْجَوَامِعُ أَوْ أَكْثَرُهَا،

অর্থাৎ, আমি এই সুনান গ্রন্থটির সংকলনকার্য সমাপ্ত করে আমার ওস্তাদ আবু যুরআ আর-রাযীর নিকট পেশ করলে তিনি সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণপূর্বক মন্তব্য করে বলেন, আমি মনে করি এ সুনান গ্রন্থটি জনসাধারণের হাতে পৌঁছলে এখন পর্যন্ত সংকলিত সবগুলোর অথবা অধিকাংশ হাদিসগ্রন্থ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে।

৮. **ইবনে মাজাহ (র) রচিত গ্রন্থাবলি :** ইমাম ইবনে মাজাহ (র) বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা না করলেও যে তিনটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন তা খুবই মূল্যবান, উপকারী ও প্রসিদ্ধ।

ক. سُنَنُ ابْنِ مَاجَةَ **(সুনানু ইবনে মাজাহ) :** এটি কুতুবুস সিত্তার অন্যতম একটি গ্রন্থ। মূলতঃ এ গ্রন্থ সংকলনের মাধ্যমেই তিনি মুসলিম জাতির হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

খ. تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ **(তাফসিরুল কুরআনিল কারিম) :** হাদিসের ভিত্তিতে রচিত এটি তাঁর একটি মূল্যবান তাফসির গ্রন্থ।

গ. تَارِيْخُ مَلِيْحِ **(তারিখু মালিহ) :** কোনো কোনো মনীষী এ গ্রন্থটিকে تَارِيْخُ كَامِلِ (তারিখু কামিল) বলে উল্লেখ করেছেন। এটি নির্ভরযোগ্য তথ্য ও তত্ত্বে ভরপুর একটি প্রামাণ্য ইতিহাসগ্রন্থ।

আল্লামা ইবনে কাসির (র) اَلْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ গ্রন্থে লিখেছেন, وَلِابْنِ مَاجَةَ تَفْسِيْرٌ حَافِلٌ وَتَارِيْخٌ كَامِلٌ مِنْ لَدُنِ الصَّحَابَةِ إِلَى عَصْرِهِ.

অর্থাৎ, ইবনে মাজাহ (র)-এর রয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ তাফসির এবং পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসগ্রন্থ, যাতে সাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে তাঁর সময় পর্যন্ত বিস্তারিত ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত تَارِيْخُ قَزْوِيْنَ (তারিখু কাযভিন) গ্রন্থটিকে আল্লামা ইসমাঈল পাশা আল-বাগদাদী তাঁর هَدِيَّةُ الْعَارِفِيْنَ নামক গ্রন্থে ইবনে মাজাহ (র)-এর গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোনো কোনো মনীষী এ গ্রন্থটিকে আবুল কাসেম রাফেঈর বলে অভিমত পেশ করেন।

৯. **অনুসরণীয় মাযহাব :** ইবনে মাজাহ (র) নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের অনুসারী ছিলেন কি না, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, তিনি শাফেয়ি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবি (র) বলেন, তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

আল্লামা তাহির জাযায়েরী বলেন, তিনি কোনো মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। তবে তাঁর ফিকহি মাসআলায় ইমাম শাফেয়ি, আহমাদ ইবনে হাম্বল (র), ইসহাক, আবু ওবায়দা প্রমুখ মনীষীর সাথে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

আবদুর রহমান মুবারকপুরী 'তুহফাতুল আহওয়াযী' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। 'ইমাম বুখারি (র) যেমন ইমাম চতুষ্টয়ের বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট ইমামের অনুসারী ছিলেন না। অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ (র) তাঁরা প্রত্যেকেই সুন্নাতের অনুসারী ও তদনুযায়ী আমলকারী এবং মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁরা কেউ কোনো ইমামের মুকাল্লিদ ছিলেন না।

১০. **ইন্তেকাল :** ইবনে কাসির ও জামালুদ্দীন ইউসুফ আল-মিযযি তাঁর মৃত্যু তারিখ, জানাযা ও দাফনকার্য সম্পাদন সম্পর্কে বলেন, 'ইবনে মাজাহ (র) ২৭৩ হিজরির মোতাবেক ৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। পরের দিন মঙ্গলবার তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। জানাযার ইমামতি করেন তার ভাই আবু বকর এবং কবরে লাশ নামান তার ভাই আবু বকর ও আবু আবদুল্লাহ এবং তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ।

مَنْهَجُهُ فِىْ تَأْلِيْفِ سُنَنِ اِبْنِ مَاجَة **(সুনানু ইবনে মাজাহ প্রণয়নপদ্ধতি) :** ইমাম ইবনে মাজাহ (র) তাঁর সুনান গ্রন্থটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। যথা-

১. হাদিস নির্বাচন পদ্ধতি,

২. গ্রন্থনা পদ্ধতি।

পদ্ধতি দু'টির বিস্তারিত বর্ণনা নিচে প্রদত্ত হলো–

১. হাদিস নির্বাচন পদ্ধতি : কঠোর সতর্কতা ও উসূলে হাদিসের মানদণ্ডে যাচাইবাছাইয়ের মাধ্যমে হাদিস নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইমাম ইবনে মাজাহ (র) অপরাপর মনীষীর ন্যায় দুটি বিষয় গুরুত্ব দিয়েছেন।

ক. রাবিদের যাচাই বাছাই : ইমাম ইবনে মাজাহ (র) রাবিদের যাচাই বাছাই করে পাঁচ শ্রেণির রাবি হতে হাদিস গ্রহণ করেন। রাবিদের প্রকারগুলো হলো-

১. স্মরণশক্তি অত্যধিক এবং নিজ শায়খের সাথে ঘনিষ্ঠতাও বেশি।

২. স্মরণশক্তি অত্যধিক, তবে নিজ শায়খের সাথে ঘনিষ্ঠতা কম।

৩. স্মরণশক্তি কম, তবে নিজ শায়েখের সাথে ঘনিষ্ঠতা অত্যধিক।

৪. স্মরণশক্তি কম এবং নিজ শায়েখের সাথে ঘনিষ্ঠাতাও কম।

৫. দুর্বল ও গরিব বা অপরিচিত।

খ. হাদিস গ্রহণের শর্তাবলি : সিহাহ সিত্তার অপরাপর মনীষীর ন্যায় ইমাম ইবনে মাজাহ (র) হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু শর্তারোপ করেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি সহিহাইনের শর্তাবলিকে প্রধান্য দিয়েছেন।

১. সহিহাইনের শর্তাবলির অনুসরণ।

২. সহিহাইনের বাইরের সহিহ হাদিসগুলোর সংকলন।

৩. মুয়াল্লাক হাদিস উল্লেখ না করা।

৪. সহিহাইনের সকল সনদ গ্রহণযোগ্য হওয়া।

২. গ্রন্থনা পদ্ধতি : ইমাম ইবনে মাজাহ (র) তাঁর সুনানু ইবনে মাজাহ হাদিসগ্রন্থটি প্রণয়ন এবং গ্রন্থনার ক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতির অনুসরণ করেন, তা নিম্নরূপ-

ক. كِتَاب তথা পর্ব সংযোজন।

খ. باب তথা অধ্যায় সংযোজন।

গ. تَرْجَمَةُ الْبَابِ তথা অধ্যায়ের শিরোনাম সংযোজন।

ঘ. تَعَارُفُ الرُّوَاةِ তথা হাদিস বর্ণনার শেষে রাবিদের পরিচয়মূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

ঙ. রাবিদের جَرْح ও تَعْدِيْل বর্ণনা করা।

চ. ফিকহি তারতিবে বিন্যাস করা।

ছ. দুর্লভ হাদিস সন্নিবেশ করা।

خِدْمَاتٌ لِاِبْنِ مَاجَةَ فِىْ تَدْوِيْنِ الْحَدِيْثِ وَضَبْطِهِ **(হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলনে ইমাম ইবনে মাজাহ (র)-এর অবদান) :** হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাসে ইমাম ইবনে মাজাহ (র)-এর অবদান অনস্বীকার্য। গোটা জীবনে তিনি ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পরিভ্রমণ করে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে মুসলিম উম্মার স্মৃতিপটে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর অনবদ্য সংকলনগুলো হচ্ছে-

১. আস সুনান : এটি হাদিসশাস্ত্রে তাঁর অনবদ্য কীর্তি, যা সিহাহ সিত্তার অন্তর্গত এক বিরাট হাদিস সংকলন। হুকুম আহকামের জামে একটি গ্রন্থ। এতে সর্বমোট ৪৩৪১টি হাদিস রয়েছে। তন্মধ্যে ৩০০২টি হাদিস অন্যান্য পাঁচটি সহিহ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। আর ১৩৩৯টি হাদিস ইমাম ইবনে মাজাহ-এর নিজস্ব সংগ্রহ। এতে ৩২টি পর্ব এবং ১৫০০টি অধ্যায় রয়েছে।

২. আত তাফসির : হাদিসের ভিত্তিতে আল কুরআনের একটি বিরাট তাফসির গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি। হাফেয ইবনে কাসির (র) এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ইমাম সুয়ূতি (র) এটাকে তৃতীয় স্তরের তাফসির গ্রন্থের মধ্যে গণ্য করেছেন।

৩. আত তারিখ : তাঁর অপর অনন্য সৃষ্টি হলো ইতিহাসগ্রন্থ। যাকে ইবনে খাল্লিকান 'তারিখে মালহি' এবং ইবনে কাসির 'তারিখে কামিল' বলে উল্লেখ করেছেন।

বস্তুত হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলনের জগতে তাঁর অনবদ্য অবদান হচ্ছে সুনানু ইবনি মাজার সংকলন।

সমাপনী : ইমাম ইবনে মাজাহ (র) মুসলিম মনীষীর তালিকায় অবিস্মরণীয় একটি নাম। ইলমে হাদিসের সংকলন, গ্রন্থায়ন, মূল্যায়ন ও ত্রুটিমুক্ত করণে তাঁর অবদান অতুলনীয়। বিশ্বব্যাপি মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে ইমাম ইবনে মাজাহ (র) তাই অগাধ সম্মানের পাত্র।

বিষয় : শরহু মাআনিল আছার লিল ইমাম আত তাহাভি (চতুর্থ পত্র)

বিষয় কোড : 611104

এসাইনমেন্টের শিরোনাম : ইমাম তাহাভি (র) এর জীবনী ও তার রচিত গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য।

শিক্ষার্থীর নাম	:	শিক্ষকের নাম	: .....
শ্রেণি	:	শিক্ষকের স্বাক্ষর	: .....
রেজি নং	:	পদবি	: .....
রোল নং	:	তারিখ	: .....
বিভাগ	:	মূল্যায়ন	: .....
সেশন	:		
পরীক্ষার বছর	:		
পর্ব	:		

সমাধান : ভূমিকা : ইলমে হাদিস শরিয়তের অন্যতম জ্ঞানভান্ডার। হাদিসে নববির এ বিশাল ভান্ডার সংকলনে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের মধ্যে ইমাম আবু জাফর তহাবি (র) অন্যতম। তিনি একই বিষয়ে বিভিন্ন হাদিস থেকে আকলি ও নকলি দলিলের ভিত্তিতে মাসয়ালা-মাসায়েল উদঘাটন করেছেন। তিনি একাধারে ছিলেন মুহাদ্দিস, ফকিহ, কালাম শাস্ত্রবিদ এবং তর্কশাস্ত্রবিদ। হাদিসশাস্ত্রে তাঁর সংকলিত কিতাব شَرْحُ مَعَانِى الْأَثَارِ এবং شَرْحُ مُشْكِلِ الْأَثَارِ ইলমি জগতে অবস্মরণীয় হয়ে থাকবে। নিচে এ মহান মনিষীর জীবনালেখ্য বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

ইমাম আবু জাফর আত তহাবি (র)-এর জীবনী

পরিচয় : তাঁর মূল নাম আহমদ, উপনাম আবু জাফর (أَبُوْ جَعْفَرٍ) পিতার নাম মুহাম্মদ, মাতার নাম ফাতেমা। দাদার নাম সালামাহ।

বংশতালিকা : ইমাম আবু জাফর তহাবি (র)-এর নসবনামা তথা বংশতালিকা নিম্নরূপ–

اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ سَلِيْمِ بْنِ سُلَيْمَانَ خَبَابَ الْأَزْدِى الْحَجَرِى الْمِصْرِى الطَّحَاوِىُّ الْحَنَفِى.

জন্ম : ইমাম তহাবি (র) ২৩৯ মতান্তরে ২৩৮ হিজরি সন মোতাবেক ৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের অন্যতম এলাকা তহা (طحا) নামক এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এ স্থানের প্রতি সম্পর্কযুক্ত করে তাকে তহাবি বলা হয়।

শৈশবকাল : ইমাম আবু জাফর তহাবি (র)-এর পরিবার ছিল ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার। তাঁর মামা ছিলেন ইমাম শাফেয়ি (র)-এর অন্যতম অনুসারী ইমাম মুযানি (র)।

ছোটবেলা থেকেই তিনি ইলমি পরিবেশে লালিত-পালিত হন। ইলমে দ্বীন শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ছোটবেলা থেকেই তাঁর ছিল তীব্র। তিনি শৈশবকাল থেকেই অনুপম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর শৈশবকালের প্রকৃতি দেখেই বুঝা যেত, তিনি একদিন 'মহান মনীষী' হবেন। কেননা প্রবাদ আছে, Morning Shows the day.

শিক্ষাজীবন : ইমাম তহাবি (র)-এর শিক্ষা জীবনের হাতেখড়ি হয় তাঁর মামা আবু ইবরাহীম ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া মুযানি (র)-এর কাছে। তিনি ইমাম শাফেয়ি (র)-এর একনিষ্ঠ অনুসারী ও শাগরিদ ছিলেন, ইমাম মুযানি (র) মিসরে অবস্থান করতেন। এ কারণে ইমাম তহাবি (র) জ্ঞান পিপাসা নিবারণের জন্য নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করে মিসরে তাঁর মামার কাছে চলে আসেন। পরবর্তীতে তিনি তৎকালীন মিসরের বিচারপতি আহমদ ইবনে আবু ইমরান হানাফি (র) এর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর কাছে ইলমে ফিকহ অধ্যয়ন করেন। তিনি ইরাকি ফিকহের ওপর বিশেষ গবেষণা করতেন এবং শেষ পর্যন্ত শাফেয়ি মাযহাব ত্যাগ করে হানাফি ফিকহের চর্চা ও গবেষণায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন।

তিনি সিরিয়ার বিচারপতি ও ইমাম ঈসা ইবনে আবান (র)-এর ছাত্র আবু হাযেম আবদুল হামীদ (র)-এর কাছে ফিকহে হানাফি অধ্যয়ন করেন। এভাবে চলতে থাকে তাঁর জ্ঞান অন্বেষণের ধারা। এক পর্যায়ে তিনি ফিকহে হানাফি ও হাদিসশাস্ত্রে বিশেষত্ব অর্জন করে পণ্ডিত ব্যক্তিতে পরিণত হন।

জ্ঞান আহরণে ভ্রমণ : ইমাম আবু জাফর তহাবি (র) জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ সফর করেন। যেখানেই কোনো জ্ঞান তাপসের সন্ধান পেতেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেন এবং জ্ঞান পিপাসা নিবৃত করতেন। ২৬৮ হিজরিতে তিনি সিরিয়া ভ্রমণ করেন। তাছাড়া তিনি ইলমে হাদিস ও ইলমে ফিকহ অর্জনের জন্য বায়তুল মুকাদ্দাস, আসকালানসহ পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করেন, বহু মনীষীর কাছে গমন করেন বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি দামেশকের আবু আযেম আবদুল হাদীদ থেকে ইলমে ফিকহের জ্ঞান লাভ করেন। বিভিন্ন মনীষীর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন শেষে ২৬৯ হিজরিতে স্বদেশে ফিরে আসেন।

উস্তাদবৃন্দ : জ্ঞানের এ সাধক হারানো সম্পদের মতো জ্ঞানের ভান্ডার খোঁজার জন্য অসংখ্য উস্তাদের নিকট গমন করেন। তার জ্ঞান সাধনার পরিব্যাপ্তি ছিল ফিকহ, তাফসির, হাদিস, আরবি সাহিত্য, নাহু, সরফ, বালাগাত, মানতিক ইত্যাদি বিষয়ে। সে জন্য তিনি ছুটেও চলেন বহুবিধ জ্ঞানীর সন্নিকটে। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন,

১. ইবরাহিম ইবনে মুসা ইবনে জামিল।
২. ইবরাহিম ইবনুল হাসান।

৩. ওয়াহবান ইবনে উসমান আল ওয়াসেতি।
৪. ইবরাহিম ইবনে মারজুক ইবনে দিনার।
৫. আহমদ ইবনে সিনান।
৬. আহমদ ইবনে আবদুর রহমান মিশরি।
৭. রবি ইবনে সুলাইমান আল জীযি আল মিশরি।
৮. আব্দুল আলা ইবনে হাম্মাদ আন নুরসি।
৯. আহমদ ইবনে মাসউদ মাকদাসি।
১০. আহমদ ইবনে সাইদ ফাহরি।
১১. আবু বশীর আহমদ দুলাবি।
১২. ইসহাক ইবনে হাসান।
১৩. ইসহাক ইবনে ইবরাহিম।
১৪. ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া মুযানি।
১৫. বাহার ইবনে নসর খাওলানি।
১৬. বাকার ইবনে কুতাইবা।
১৭. মুহাম্মদ ইবনে সালামা তহাবি (র) প্রমুখ।

শিক্ষকতা জীবন ও ছাত্রবৃন্দ : ইমাম আবু জাফর তহাবি (র)-এর জ্ঞানের মশাল যখন চতুর্দিক আলোকিত করতে লাগল, তখন সে আলোয় আলোকিত জীবন গড়তে তার শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য উদগ্রীব ছিলেন তৎকালীন ছাত্র সমাজ। অসংখ্য ছাত্র তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নিচে তাঁর কয়েকজন ছাত্রের নাম উল্লেখ করা হলো।

১. আবু মুহাম্মদ আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ আততামিমি।
২. আহমদ ইবনে কাসেম ইবনে আবদুল্লাহ আল বাগদাদি।
৩. আবু বকর মক্কী ইবনে আহমদ আল বারদায়ি।
৪. আবুল কাসেম মাসলামা ইবনে কাসেম।
৫. আবুল কাসেম ওবায়দুল্লাহ ইবনে আলী দাউদি।
৬. আল হাসান ইবনে কাসেম।
৭. আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল আখিমি।
৮. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম।
৯. আবু উসমান আহমদ ইবনে ইবরাহিম।
১০. সোলায়মান ইবনে আহমদ তিবরানি।

ইলমি যোগ্যতা ও তার স্তর : ইমাম আবু জাফর তহাবি (র) অসাধারণ ধীশক্তি ও তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। জ্ঞানের মহাসমুদ্র তিনি সামলিয়েছেন সারাটি জীবন। ফলে এক পর্যায়ে তিনি ইলমে ফিকহ শাস্ত্রের জাহাজে পরিণত হন। এজন্য ওলামায়ে আহনাফের মধ্যে তিনি অন্যতম স্থান দখন করে আছেন। আল্লাফা কুফুভি (র) اَلطَّبَقَاتُ নামক গ্রন্থে ইমাম তহাবি (র)-কে হানাফি মাযহাবের ইমামগণের দ্বিতীয় স্তরে গণ্য করেছেন।

শাহ আবদুল আযীয (র) বলেন, ইমাম তহাবি কর্তৃক লিখিত اَلْمُخْتَصَرُ গ্রন্থটি দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়, ইমাম তহাবি নিজেই একজন মুজতাহিদ ছিলেন। তাই তিনি ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মুকাল্লিদ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করলেও কোনো কোনো মাসয়ালায় তিনি হানাফি মাযহাবের সাথে মতবিরোধও করেছেন।

মাওলানা আবদুল হাই (র) ইমাম তহাবি (র)-কে ওলামায়ে আহনাফের দ্বিতীয় স্তরে স্থান দিয়েছেন। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর চেয়ে মর্যাদাগত দিক দিয়ে ইমাম তহাবি (র)-এর স্থান মোটেও কম নয়।

অন্য দিকে সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান আল মুজাদ্দেদী আল বারাকাতি (র) তাকে فُقَهَاءُ أَحْنَافٍ-এর মধ্যে তৃতীয় স্তরে গণ্য করেছেন।

তাঁর ব্যক্তিত্ব : ইমাম তহাবি (র)-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আল্লামা আইনি (র) তার نُخَبُ الْاَفْكَارِ গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম তহাবি (র)-এর নির্ভরযোগ্যতা, আমানতদারী, মর্যাদার পূর্ণতা, হাদিসের দক্ষতা, নাসেখ-মানসুখ ও হাদিসের পার্থক্য করণের দক্ষতার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। তারপর কেউ তার স্থান পূর্ণ করতে পারেননি।

আল্লামা যাহাবি (র) তারিখে কবির গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি ফিকহবিদ, মুহাদ্দিস, হাফেয, প্রখ্যাত ইমাম, নির্ভরশীল ও দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন।

মাসলামা ইবনে কাসেম কুরতুবি (র) বলেন, ইমাম তহাবি (র) নির্ভরশীল মহামর্যাদার অধিকারী ফিকহবিদ এবং আলেমগণের মতভেদপূর্ণ মাসয়ালায় অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন।

রচিত গ্রন্থাবলি : ইমাম আবু জাফর তহাবি (র) অসংখ্য কিতাব প্রণয়ন করেছেন। তার রচিত গ্রন্থাবলি সর্বজন সমাদৃত হয়েছে। তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি নিম্নরূপ–

১. শরহু মায়ানিল আছার (شَرْحُ مَعَانِى الْاٰثَارِ)
২. শারহু মুশকিলুল আছার (شَرْحُ مُشْكِلِ الْاٰثَارِ)
৩. আহকামুল কুরআন (أَحْكَامُ الْقُرْاٰنِ)
৪. আলমুখতাছার ফিল ফিকহ (اَلْمُخْتَصَرُ فِى الْفِقْهِ)
৫. শরহুল জামিয়িল কাবীর (شَرْحُ الْجَامِعِ الْكَبِيْرِ)
৬. শরহুল জামিয়িস সগীর (شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ)

৭. আশশুরুতুল কাবীর (اَلشُّرُوْطُ الْكَبِيْرُ)
৮. আশশুরুতুস সগীর (اَلشُّرُوْطُ الصَّغِيْرُ)
৯. আশশুরুতুল আওসাত (اَلشُّرُوْطُ الْاَوْسَطُ)
১০. আলমুহাদ্বির (اَلْمُحَاضِرُ)
১১. আসসিজিল্লাত (اَلسِّجِلَّاتُ)
১২. কিতাবুল ওসাইয়া (كِتَابُ الْوَصَايَا)
১৩. কিতাবুল ফারায়িয (كِتَابُ الْفَرَائِضِ)
১৪. আকীদাতুত তাহাবী (عَقِيْدَةُ الطَّحَاوِيْ)
১৫. আল মুখতাসারুল কাবীর(اَلْمُخْتَصَرُ الْكَبِيْرُ)
১৬. আলমুখতাসারুস সগীর (اَلْمُخْتَصَرُ الصَّغِيْرُ)

ওফাত : যুগশ্রেষ্ঠ হাদিসবিশারদ ও হানাফি মাযহাবের অন্যতম প্রবাদপুরুষ ইমাম তহাবি (র) ৯২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইবনে খাল্লিকানের وَفَيَاتُ الْأَعْيَانِ কিতাবের ভাষ্যমতে, তিনি ৩২১ হিজরি সন মোতাবেক ৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তাকে قَرَافَة নামক স্থানে দাফন করা হয়।

শরহে মায়ানিল আছারের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ : যুগশ্রেষ্ঠ ফকিহ ইমাম আবু জাফর তহাবি (র) কর্তৃক রচিত বিশ্ব বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ شَرْحُ مَعَانِى الْاٰثَارِ-এর রয়েছে কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা অন্যান্য কিতাবে পাওয়া যায় না। তার গ্রন্থের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. **হাদিসের আলোকে মাসয়ালা :** ইমাম তহাবি (র) তাঁর স্বীয় গ্রন্থের প্রতিটি ফিকহি মাসয়ালা হাদিসের আলোকে উপস্থাপন করেছেন।
২. **অসংখ্য হাদিসের অপূর্ব সমাহার :** ইমাম আবু জাফর তহাবি (র) কর্তৃক রচিত শরহে মায়ানিল আছার গ্রন্থটিতে এত অধিক সংখ্যক হাদিস পাওয়া যায়, যা অন্যান্য গ্রন্থে এভাবে পাওয়া যায় না। বিষয়ভিত্তিক হাদিসগুলোকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা এ গ্রন্থটিকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।
৩. **পক্ষ বিপক্ষের অভিমত :** গ্রন্থাকার তাঁর কিতাবে ফিকহি মাসয়ালা বর্ণনা করার পাশাপাশি হাদিসের আলোকে পক্ষের ও বিপক্ষের অভিমত পেশ করেছেন।
৪. **সনদ বর্ণনার বিশেষত্ব :** এ গ্রন্থটির সনদ বর্ণনা পদ্ধতি অত্যন্ত চমৎকার। ধারাবাহিকভাবে সনদগুলো বর্ণিত আছে। কোনো কোনো গ্রন্থে সনদ দুর্বল থাকলেও এর সকল সনদ শক্তিশালী। অন্যান্য গ্রন্থে হাদিসের বর্ণনাধারা একটি হয়। কিন্তু এতে সনদের বর্ণনাধারা অনেক থাকে। অন্য গ্রন্থে হাদিস বর্ণিত হয় তাদলীস পদ্ধতিতে, সেখানে শ্রবণের ব্যাপার থাকে না। অথচ এ গ্রন্থে স্পষ্ট শ্রবণের ভিত্তিতে হাদিস বর্ণিত হয়।
৫. **অভিনব মতন :** এ কিতাবে বর্ণিত হাদিসগুলোর যে মতন রয়েছে, তাতে অনেক ফায়দা বিদ্যমান। যেমন অন্যগ্রন্থে যা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ আছে, এতে তা বিস্তারিতভাবে রয়েছে। এ গ্রন্থে যা مُقَيَّدٌ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, অন্য গ্রন্থে তা مطلق হিসেবে রয়েছে।
৬. **অনেক আছারের উল্লেখ :** এ কিতাবের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এতে সাহাবি, তাবেয়ি এবং তাঁদের পরবর্তী ইমামগণের বর্ণিত অনেক আছার রয়েছে, যা তাঁর সমসাময়িক কোনো ইমামের কিতাবে পরিলক্ষিত হয়নি। এ আছারগুলোর মাধ্যমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়ের সমাধান করা হয়েছে।
৭. **হাদিস ও রাবির বৈশিষ্ট্য :** এ কিতাবে বর্ণিত হাদিসগুলো এবং এর বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। যেমন– হাদিস ও বর্ণনাকারীর সঠিকতা, দুর্বলতা আর অগ্রগণ্যতার বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করা হয়েছে, যা অন্যান্য কিতাবে পাওয়া যায় না।
৮. **একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য :** সম্মানিত গ্রন্থকার এ গ্রন্থকে ফিকহশাস্ত্রের গ্রন্থাবলির আদলে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের মাধ্যমে বিন্যস্ত করেছেন। তারপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইমামগণের মতভেদসহ তাদের পক্ষের হাদিসসমূহ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর হাদিসের আলোকে প্রতিপক্ষের উত্তর দিয়েছেন। সবশেষে স্বীয় সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ অভিমত উপস্থাপন করেছেন, যা সর্বজন স্বীকৃত ও গৃহীত। এ জাতীয় বর্ণনাধারা অন্যান্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না।
৯. **হানাফি মাযহাবকে প্রাধান্য দান :** এ গ্রন্থে আহনাফের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যে কোনো বিষয়ের বর্ণনার পর তাদের দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে অন্যান্য মাযহাবকে উপেক্ষা কিংবা অবজ্ঞা করা হয়নি। বরং ভিন্নমতালম্বীদের দলিলগুলোও উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা কাওসারি (র) বলেন,
كِتَابُ مَعَانِى الْاٰثَارِ فِى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ أَدِلَّةِ الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ يَسُوْقُ بِسَنَدِهِ الْاَخْبَارَ الَّتِيْ يَتَمَسَّكُ بِهَا أَهْلُ الْخِلَافِ فِيْ تِلْكَ الْمَسَائِلِ وَيُخْرِجُ مِنْ بُحُوْثِهِ بَعْدَ نَقْدِهَا إِسْنَادًا وَمَتْنًا رِوَايَةً وَنَظَرًا بِمَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْبَاحِثُ الْمُصَنِّفُ الْمُتَبَرِّئُ مِنَ التَّقْلِيْدِ الْاَعْمٰى.
১০. **تَعْدِيْلُ ও جَرْحُ উল্লেখ :** যেসব বিশেষ বৈশিষ্টের জন্য এ গ্রন্থটি স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে তন্মধ্যে جَرْحُ ও تَعْدِيْلُ উল্লেখ করা অন্যতম। এ কিতাবে সকল ইমামের جَرْحُ ও تَعْدِيْلُ আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বর্ণনাকারীর ব্যাপারে পাঠকের স্বচ্ছ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়।
১১. **প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের বক্তব্য উল্লেখ :** এ গ্রন্থের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, এতে বিশ্বখ্যাত অনেক মুহাদ্দিসের উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে এ গ্রন্থের সৌন্দর্য আরো বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।
১২. **نَظْرُ الطَّحَاوِيِّ সংযোজন :** হানাফি মাযহাবকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ইমাম তহাবি (র) স্বীয় চিন্তাপ্রসূত অভিমত نَظْرُ الطَّحَاوِيِّ সংযোজন করেছেন।

সমাপনী : ইমাম আবু জাফর তহাবি (র) ছিলেন হানাফি মাযহাবের অন্যতম প্রবাদপুরুষ। হাদিসশাস্ত্রে তিনি ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। হাদিস, ফিকহ, আকিদা, ইতিহাস সহ বিভিন্নশাস্ত্রে তিনি কালজয়ী কিতাব প্রণয়ন করেছেন। বিশেষত হাদিসশাস্ত্রে তাঁর অনবদ্য সংকলন شَرْحُ مَعَانِى الْاٰثَارِ হানাফি মাযহাবকে সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। হানাফি মাযহাবের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উচিত এ কিতাব চর্চা অব্যাহত রাখা।

বিষয় : মুস্তালাহুল হাদিস ও মানাহিজুল মুহাদ্দিসীন (পঞ্চম পত্র)

বিষয় কোড : 611105

এসাইনমেন্টের শিরোনাম : হাদিসের পরিচয়, সংকলন, সংরক্ষণের ইতিহাস ও একজন রাবীর জীবনী।

শিক্ষার্থীর নাম	:	শিক্ষকের নাম	: .....
শ্রেণি	:	শিক্ষকের স্বাক্ষর	: .....
রেজি নং	:	পদবি	: .....
রোল নং	:	তারিখ	: .....
বিভাগ	:	মূল্যায়ন	: .....
সেশন	:		
পরীক্ষার বছর	:		
পর্ব	:		

সমাধান : تَعَارُفُ الْحَدِيْثِ : حَدِيْثٌ**-এর পরিচয়**

আভিধানিক অর্থ : حَدِيْثٌ শব্দটি اِسْم তথা বিশেষ্য। শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَحَادِيْثُ মাদ্দাহ ح د ث জিনস صَحِيْحٌ অর্থ–

১. اَلْقَوْلُ তথা কথা, বাণী। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ,

২. اَلْوَعْظُ/اَلنَّصِيْحَةُ তথা উপদেশ। যেমন কুরআনের ভাষ وَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِيْثَ ,"

৩. اَلْقِصَّةُ তথা কাহিনি, ঘটনা। যেমন– اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ

৪. اَلْخَبَرُ তথা সংবাদ বা তথ্য। যেমন আল্লাহর বাণী هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ,

৫. اَلْجَدِيْدُ তথা নতুন।

৬. اَلْقُرْاٰنُ তথা আল কুরআন। যেমন– فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِثْلِهٖ

৭. اَلْخُطْبَةُ তথা বক্তব্য। যেমন– اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا اَىْ خُطْبَةً

৮. ضِدُّ الْقَدِيْمِ তথা পুরাতনের বিপরীত।

৯. اَلْبَدِيْعُ তথা অভিনব।

১০. اَلْعَصْرِيُّ তথা আধুনিক।

১১. اَلْحَالِيُّ তথা সাম্প্রতিক।

১২. ইংরেজিতে– Speech, History, Story, News, New, Modern, Update ইত্যাদি।

সুতরাং مُصْطَلَحُ الْحَدِيْثِ-এর সম্মিলিত অর্থ হাদিসের পরিভাষা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : حَدِيْثٌ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মুহাদ্দিসিনে কিরাম বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন–

১. মিযানুল আখবার প্রণেতা বলেন, اَلْحَدِيْثُ هُوَ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ قَوْلَ الرَّسُوْلِ (ص) وَالصَّحَابِىِّ وَالتَّابِعِىِّ وَفِعْلِهٖ وَتَقْرِيْرِهٖ অর্থাৎ, ব্যাপক অর্থে রাসূল (স), সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়িগণের বাণী এবং রাসূল (স)-এর কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদিস বলে।

২. জুমহুর মুহাদ্দিসিনের মতে, اَلْحَدِيْثُ مَا اُضِيْفَ اِلَى النَّبِىِّ (ص) مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيْرٍ وَكَذٰلِكَ يُطْلَقُ عَلٰى قَوْلِ الصَّحَابِىِّ وَالتَّابِعِىِّ وَفِعْلِهِمْ وَتَقْرِيْرِهِمْ. অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর প্রতি সম্পৃক্ত কথা, কাজ ও মৌনসমর্থন, অনুরূপ সাহাবি ও তাবেয়িগণের কথা, কাজ ও মৌনসমর্থনকেও হাদিস বলে।

৩. শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভি (র) বলেন, اَلْحَدِيْثُ يُطْلَقُ عَلٰى قَوْلِ النَّبِىِّ (ص) وَفِعْلِهٖ وَتَقْرِيْرِهٖ অর্থাৎ, حَدِيْثٌ রাসূল (স)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়।

৪. গ্রন্থকার বলেন اَلْحَدِيْثُ مَا اُضِيْفَ اِلَى النَّبِىِّ (ص) مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيْرٍ اَوْ صِفَةٍ تَيْسِيْرُ مُصْطَلَحِ الْحَدِيْثِ , অর্থাৎ حَدِيْثٌ , হলো যে কথা, কাজ, মৌনসম্মতি ও গুণ রাসূল (স)-এর প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়।

৫. কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেন, اَلْحَدِيْثُ هُوَ قَوْلُ الرَّسُوْلِ وَفِعْلُهٗ وَتَقْرِيْرُهٗ وَصِفَتُهٗ وَحَرَكَاتُهٗ وَسَكَنَاتُهٗ অর্থাৎ, حَدِيْثٌ হলো রাসূল (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি, গুণ, নড়াচড়া ও স্থিরতা।

৬. ইংরেজিতে বলা হয়, Hadith is the words, actions, and the silent approval of the Messenger of Allah (peace be upon lim). অর্থাৎ, হাদিস হলো রাসূল (স)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতি।

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায়, রাসূল (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি ও গুণাবলিকে হাদিস বলে।

হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের ইতিহাস : রাসুল (স)-এর ওফাতের পর বিভিন্ন কারণে হাদিস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এসব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা হাদিস সংকলনের প্রক্রিয়াকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করতে পারি। যথা–

১. খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে হাদিস সংকলন।
২. ওমর ইবনে আবদুল আযিয (র)-এর যুগে হাদিস সংকলন।
৩. হিজরি প্রথম শতকে হাদিস সংকলন।
৪. হিজরি দ্বিতীয় শতকে হাদিস সংকলন।
৫. হিজরি তৃতীয় শতকে হাদিস সংকলন।

নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো–

১. **খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে হাদিস সংকলন :** মহাগ্রন্থ আল কুরআন গ্রন্থাকারে পরিপূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ হলে কুরআন ও হাদিসের মাঝে সংমিশ্রণের আশঙ্কা দূরীভূত হয়ে যায়। আর তখন থেকে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িগণ হাদিস সংকলনের প্রতি সচেষ্ট হন। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

   ১. **আবু বকর (রা) :** আবু বকর সিদ্দিক (রা) নিজে পাঁচশত হাদিসের একটি সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন, তবে শেষ জীবনে তিনি নিজেই তা নষ্ট করে ফেলেন। কেননা তিনি ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন, না জানি কোনো শব্দ ভুল হয়ে যায়। দেখা যায়, তিনি রাসুল থেকে একেবারেই কমসংখ্যক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

   ২. **ওমর (রা) :** ওমর ফারুক (রা) ইসলামের ভিত্তি হিসেবে কুরআনের পরেই হাদিসকে স্থান দিতেন। তিনি তাঁর শাসনকার্য পরিচালনায় হাদিস লিপিবদ্ধ করে শাসকদের নিকট প্রেরণ করতেন। তাঁর খেলাফতকালে আবু মুসা আশয়ারী (রা) কুফার শাসনভার গ্রহণ করে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন– بَعَثَنِىْ اِلَيْكُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (رض) أُعَلِّمُكُمْ كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّكُمْ.

   আর এতেই প্রমাণিত হয়, ওমর (রা)-এর হাদিসের প্রতি অনুরাগ কতটা গভীর ছিল।

   ৩. **ওসমান (রা) :** তৃতীয় খলিফা ওসমান (রা) খুব কম সংখ্যক হাদিস বর্ণনা করেছেন। কেননা, তিনি ভুল হওয়ার আশঙ্কায় হাদিস বর্ণনা করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতেন।

   ৪. **আলি (রা) :** যে কয়জন সাহাবি হাদিস লিপিবদ্ধ করেছিলেন আলি (রা) তাঁদের অন্যতম। তাঁর লিখিত গ্রন্থটির নাম ছিল সহিফা। অবশ্য সাহাবায়ে কেরামের এ সংগ্রহ ও সংকলন ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে। তবে সামগ্রিকভাবে হাদিস সংকলন হয়েছিল পঞ্চম খলিফাখ্যাত ওমর ইবনে আবদুল আযিয (র)-এর শাসনামলে।

২. **ওমর ইবনে আবদুল আযিযের শাসনামলে হাদিসে সংকলন :** হিজরি ৯৯ সালে ওমর ইবনে আবদুল আযিয (র) খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি হাদিসের এ বিক্ষিপ্ত সম্পদকে একত্রিত করে সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি ইসলামি রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে নিম্নোক্ত ফরমান লিখে পাঠান– اُنْظُرُوْا حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْمِعُوْا.

অর্থাৎ, দেখ এবং রাসুল (স)-এর হাদিসসমূহ সংকলন কর। অনুরূপভাবে মদিনার শাসনকর্তা ও বিচারপতি আবু বকর ইবনে হাযমকেও নিম্নোক্ত ফরমান লিখে পাঠান– اُنْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَوْ سُنَنِهٖ اَوْ حَدِيْثِ عُمَرَ اَوْ نَحْوِ هٰذَا فَاكْتُبْهُ لِىْ فَاِنِّىْ خِفْتُ دُرُوْسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ.

অর্থাৎ, মহানবি (স)-এর হাদিস, তাঁর সুন্নত কিংবা ওমর (রা) এর বাণী অথবা অনুরূপ যা কিছু পাওয়া যায় তার প্রতি দৃষ্টি দাও এবং আমার জন্য লিখে নাও। কেননা আমি ইলমে হাদিসের ধারকদের অন্তর্ধান ও হাদিস সম্পদের বিলুপ্তির আশঙ্কাবোধ করছি। সাথে সাথে তিনি হাদিস সংগ্রহকারীদের উদ্দেশ্য বলেন–

وَلَا يُقْبَلُ اِلَّا حَدِيْثُ النَّبِىِّ (ص) وَلْيُفْشُوا الْعِلْمَ وَلْيَجْلِسْ حَتّٰى يَعْلَمَ فَاِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتّٰى يَكُوْنَ سِرًّا.

কাযী আবু বকর খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযিয (র)-এর আদেশ অনুসারে বিপুলসংখ্যক হাদিস সংগ্রহ ও হাদিসের কয়েকখানি খণ্ড গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। কিন্তু খলিফার ইন্তেকালের পূর্বে তাদারুল খিলাফাতে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

৩. **হিজরি প্রথম শতকে হাদিস সংকলন :** হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে সাহাবি ও তাবেয়িগণ প্রয়োজন অনুসারে কিছু হাদিস লিখে রাখেন। অতঃপর উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযিয (র)-এর অনুমতিক্রমে ইমাম শাবী, ইমাম যুহরী, ইমাম মাকহুল দামেশকী (র) প্রমুখ হদিস সংকলনে মনোবিবেশ করেন। এ যুগের ইমামগণ কেবল দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় হাদিসগুলো এবং স্থানীয় হাদিস শিক্ষাকেন্দ্রে প্রাপ্ত হাদিসসমূহ লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

৪. **হিজরি দ্বিতীয় শতকে হাদিস সংকলন :** হিজরি দ্বিতীয় শতকের প্রথম থেকে হাদিস সংকলনের কাজ বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হয়। তবে এ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ কাজ নিয়মিতভাবে চলতে থাকে। এ যুগে সংকলিত গ্রন্থগুলো হলো–

১. কিতাবুল আছার – ইমাম আযম আবু হানিফা।
২. মুয়াত্তা – ইমাম মালেক।
৩. আল জামে – সুফিয়ান সাওরী।
৪. কিতাবুস সুনান – ইমাম মাকহুল।
৫. কিতাবুস সুনান – আবু আমর আওযায়ী।
৬. কিতাবুস সুনান – আবু সাঈদ ইয়াহিয়া ইবনে যাকারিয়া।
৭. কিতাবুল মাগাযী – আবু বকর ইবনে হাযম।
৮. কিতাবুস সুনান, কিতাবুয যুহদ, কিতাবুল মানাকিব – যায়েদ ইবনে কুদামা।
৯. ইমাম শাবী (র) একই বিষয়বস্তুর উপর একখানা গ্রন্থে প্রণয়ন করেছিলেন কিন্তু তা মাত্র কয়েকটি অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। এর বেশি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এ যুগের হাদিস সংকলন পদ্ধতিকে বলা হয় تَدْوِيْنُ (তাদভীন)।

৫. **হিজরি তৃতীয় শতকে হাদিস সংকলন :** হিজরি তৃতীয় শতকে মুসলিম বিশ্বে যারা হাদিস শিক্ষাদান ও গ্রন্থ প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। তাদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন, আলী ইবনুল মাদানী, ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন, আবু জুযয়া রাযী, আবু হাতেম রাযী, মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী, ইবনে খোযায়মা, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহে, মুহাম্মদ ইবনে সাদ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) প্রমুখ। এ সময় 'মুসনাদ' সংকলন করা হয়। এ শতকের শেষ দিকে প্রসিদ্ধ হাদিসগ্রন্থ 'সিহাহ সিত্তাহ' ও সংকলিত হয়। এ যুগকে হাদিস সংকলনের সোনালি যুগ বলা হয়।

আবু হুরায়রা (রা) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী : হযরত আবু হুরায়রা (রা) ছিলেন মুকছিরীন সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত এবং তার থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যাই সর্বাধিক। নিচে তার জীবন ও পরিচয় উপস্থাপন করা হলো।

নাম ও পরিচয় : হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর প্রকৃত নাম নির্ধারণ করতে গিয়ে বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়। নিচে প্রসিদ্ধ নামগুলো উপস্থাপন করা হলো–১. আবদুর রহমান, ২. আবদে শামস, ৩. আবদে আমর, ৪. আবদুল্লাহ, ৫. সাঈদ, ৬. আমের, ৭. ইবনে ওমায়ের, ৮. ইয়াযিদ, ৯. আমর ১০. আবদুল উযযা।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ও পরে তার নাম : ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল আবদে শামস বা আবদে আমর এবং ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম রাখা হয় আবদুল্লাহ বা আবদুর রহমান। উপনাম আবু হুরায়রা। তিনি এ নামেই প্রসিদ্ধ।

জন্ম : তিনি হিজরতের প্রায় ২২/২৩ বছর পূর্বে ৫৯৫/৬০০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

বংশ পরিচয় : তার পিতার নাম সাখর। এছাড়াও তার পিতার আরো কয়েকটি নাম রয়েছে। যেমন– ক. ওমায়ের, খ. আশরাকা, গ. আমর, ঘ. আয়েয। তবে তিনি সাখর নামে প্রসিদ্ধ হওয়ায় হযরত আবু হুরায়রা (রা) আবদুর রহমান ইবনে সাখর নামে পরিচিত ছিলেন। তার মাতার নাম উম্মিয়া বিনতে সাফিহ অথবা মাইমুনা। তার পূর্বপুরুষদের কারো নাম দাউস থাকায় তাকে দাউসীও বলা হতো। অথবা তাকে আযদী বলা হতো। কারণ, তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের মুসলিম ইবনে ফাহম বংশোদ্ভূত ছিলেন।

আবু হুরায়রা নামে প্রসিদ্ধিলাভের কারণ : আরবি ভাষায় اَبُ শব্দের অর্থ– ذُوْ (ওয়ালা)। আর هِرَّةٌ শব্দটি هُرَيْرَةٌ এর تَصْغِيْرٌ তথা ক্ষুদ্রতাবাচক। অর্থ- বিড়ালছানা। সুতরাং اَبُوْ هُرَيْرَةَ শব্দের অর্থ হলো– বিড়ালছানা ওয়ালা। আরবদের ব্যবহারে জীবজন্তু বা পদার্থের পূর্বে اَبُ শব্দ যুক্ত হলে তার অর্থ হয় মালিক। সুতরাং اَبُوْ هُرَيْرَةَ অর্থ– বিড়ালছানার মালিক। তবে এ নামে প্রসিদ্ধিলাভের কারণ সম্পর্কে ওলামায়ে কিরামের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

ক. জুমহুর আলেমের মতে, তিনি বিড়ালছানা পুষতেন। একদিন তিনি রাসূল (স) এর দরবারে উপস্থিত হলেন। এ সময় হঠাৎ তার জামার আস্তিন হতে একটি বিড়ালছানা বের হলো। রাসূল (স) তখন মজা করে তাকে يَا اَبَا هُرَيْرَةَ বলে সম্বোধন করেন। প্রিয়নবী (স) এর মুখনিঃসৃত নাম বরকতময় মনে করে এটাকে নিজের নাম বানিয়ে নেন তিনি। এরপর থেকে তিনি اَبُوْ هُرَيْرَةَ নামেই প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

খ. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবি (র) বলেন– اِنَّمَا سُمِّىَ اَبَا هُرَيْرَةَ لِاَنَّه كَانَ لَه هِرَّةٌ صَغِيْرَةٌ يَحْمِلُهَا مَعَه .

গ. ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থকার বলেন, তিনি বিড়ালছানা অত্যধিক ভালোবাসতেন বিধায় এ নামে ভূষিত হন।

ইসলামগ্রহণ : সর্বসম্মত মতানুসারে তিনি ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে ৩৪ বছর বয়সে খায়বার যুদ্ধের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এরপর থেকে তিনি স্থায়ীভাবে আহলে সুফফার সদস্য হয়ে যান।

রাসূল (স) এর সাহচর্য : ইসলামগ্রহণের পর আবু হুরায়রা (রা) সর্বদা রাসূল (স) এর সাহচর্যে থাকতেন। তিনি ছিলেন আহলে সুফফার স্থায়ী সদস্য।

হাদিস বর্ণনা : সাহাবায়ে কিরামের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি। কেউ কেউ বলেন, তার বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৫৫৭৫টি। তন্মধ্যে বুখারী মুসলিমে বর্ণিত হাদিস ৩২৫টি। শুধু বুখারিতে ৭৯টি এবং মুসলিমে ৯৩টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

মহানবী (স) কর্তৃক দোয়া : হযরত আবু হুরায়রা (রা) প্রথমে হাদিস শুনে মুখস্থ রাখতে পারতেন না। মহানবী (স) কে এ বিষয়ে জানালে তিনি বললেন– اُبْسُطْ رِدَائَكَ অর্থাৎ, তোমার চাদর বিছিয়ে দাও। তিনি চাদর বিছিয়ে ধরলে রাসূল (স) তাতে ফুঁক দেন এবং বলেন, বুকের সাথে এটি জড়িয়ে ধরো, এরপর তিনি একটি হাদিসও ভুলেননি।

তার শিষ্য : বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, আটশতেরও বেশি সংখ্যক সাহাবি ও তাবেয়ি তার নিকট হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আসহাবে সুফফার সদস্য : তিনি ছিলেন আহলে সুফফার স্থায়ী সদস্য। রাসূল (স) এর দরবারে হাদিয়াস্বরূপ যা আসত, তা থেকেই তিনি আহার করতেন।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : তিনি হযরত উমর (রা) এর শাসনামলে বাহরাইন প্রদেশের শাসনকর্তা এবং মুয়াবিয়া (রা) এর শাসনামলে মদিনার শাসক মারওয়ানের স্থলাভিষিক্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন।

শারীরিক গঠন : তিনি ছিলেন গৌর বর্ণের। কাঁধ দুটি ছিল প্রশস্ত আর মেজাজ ছিল কোমল।

চরিত্র মাধুর্য : হযরত আবু হুরায়রা (রা) ছিলেন জালিলুল কদর সাহাবিদের একজন। তিনি সরল জীবনযাপন করতেন। তার মেধা ও অসাধারণ ব্যুৎপত্তির কারণে হযরত উমর (রা) তাকে বাহরাইনের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। তার সরলতা, সততা এবং বিশ্বস্ততা ছিল প্রশ্নাতীত। তার থেকে রাসূল (স) এর বহু গুরুত্বপূর্ণ হাদিস এবং ইসলামের বহু দুর্লভ জ্ঞান বর্ণিত হয়েছে।

ইন্তিকাল : হযরত আবু হুরায়রা (রা) হিজরি ৫৯ সালে ৭৮ বছর বয়সে মদিনার অদূরে কাসওয়া নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।

জানাযা ও দাফন : হযরত ওলীদ ইবনে ওকবা (রা) তার জানাযায় ইমামতি করেন। সাহাবিগণের মধ্য থেকে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও আবু সাঈদ খুদরি (রা) তার জানাযায় শরিক হন। তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

বিষয় : আত তারিখুল ইসলামি ও তারিখু ইলমিল হাদিস (ষষ্ঠ পত্র)

বিষয় কোড : 611106

এসাইনমেন্টের শিরোনাম : রাসূল (স) এর জীবন চরিত।

শিক্ষার্থীর নাম	:	শিক্ষকের নাম	: .....
শ্রেণি	:	শিক্ষকের স্বাক্ষর	: .....
রেজি নং	:	পদবি	: .....
রোল নং	:	তারিখ	: .....
বিভাগ	:	মূল্যায়ন	: .....
সেশন	:		
পরীক্ষার বছর	:		
পর্ব	:		

সমাধান : ভূমিকা : আরব দেশ যখন ঘোর তমসায় আচ্ছন্ন। অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত পুরো জাতি। ইহুদিরা ওযায়ের (আ)-কে বলে আল্লাহর পুত্র। ঈসা (আ)-এর খ্রিষ্ট ধর্ম তিন স্রষ্টার বিশ্বাসে বিশ্বাসী। পারস্য শক্তি অগ্নিপূজায় নিমজ্জিত। এমনি এক সংকটময় বিশ্ব পরিস্থিতিতে আবির্ভূত হন বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)। বিখ্যাত দার্শনিক টমাস কার্লাইল জাহেলিয়াতের অন্ধকারে মহানবী (স)-এর আবির্ভাবকে জ্যোতির্ময় স্ফুলিঙ্গের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন– These Arabs, the man Mohammad and that one century is it not as if a spork.

সমগ্র বিশ্বের হিদায়াতের জন্য পরম আকাঙ্ক্ষিত, প্রতিশ্রুত মুক্তির বার্তাবাহক সত্য ও ন্যায়ের ঝাণ্ডা নিয়ে পবিত্র আরব ভূমিতে সৃষ্টিকুলের রহমতস্বরূপ তিনি আবির্ভূত হন। যাঁর আগমনের পূর্ব মুহূর্তে লুটিয়ে পড়েছিল পারস্য সাম্রাজ্যের গৌরবময় রাজপ্রাসাদের চৌদ্দটি স্তম্ভ; নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল অগ্নিপূজকদের সহস্র বর্ষব্যাপী প্রজ্বলিত বিশাল অগ্নিকুণ্ড। শুকিয়ে গিয়েছিল শ্বেতসাগরের পানি; নহর বয়ে গিয়েছিল সিরিয়ার মরুতে, ভূলুণ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল কাবা অভ্যন্তরের দেবমূর্তিগুলো। এভাবেই শুভাগমন হয়েছিল সৃষ্টিকুলের সেরা মহামানব প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর।

বংশ পরিচিতি

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশতালিকা হলো– মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কাব ইবনে লুওয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফিহর ইবনে মালেক ইবনে নযর ইবনে কেনানা ইবনে খুযায়মা ইবনে মুদরিকা ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুযার ইবনে নযর ইবনে মায়াদ ইবনে আদনান।

বুখারী শরীফে আবির্ভাব অধ্যায়ে ইবনে আদনান পর্যন্তই রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশ পরম্পরা বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম বুখারী (র) তাঁর লিখিত ইতিহাসে আদনান থেকে হযরত ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স)-এর যে বংশ পরম্পরা বর্ণনা করছেন তা হচ্ছে– আদনান ইবনে মুকাব্বেম ইবনে তারেব ইবনে ইয়াশজাব ইবনে ইয়ারুব ইবনে নাবেত ইবনে ইসমাঈল (আ) ইবনে ইবরাহীম (আ)।

মাতৃকুলের দিক থেকে তাঁর বংশ পরম্পরা হলো– আমেনা বিনতে ওহাব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে যুহরা ইবনে কিলাব– এ পঞ্চম সিঁড়িতে গিয়ে পিতৃমাতৃ উভয়কুলের বংশ পরম্পরা এক হয়ে যায়।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

জন্ম : রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মতারিখ নির্ধারণে ইতিহাসবিদদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ঐতিহাসিক তাবারি, ইবনে খালদুন, ইবনে হিশাম প্রমুখ ১২ রবিউল আউয়াল নির্দেশ করেছেন, কিন্তু ঐতিহাসিক আবুল ফিদা বলেন, এ মাসের দশ তারিখে রাসূল (স)-এর জন্ম হয়েছিল। তবে সব ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন, রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্ম হয়। আধুনিক মুসলিম ঐতিহাসিকগণ সূক্ষ্ম হিসাব করে দেখিয়েছেন, ১২ বা ১০ তারিখ সোমবার হতে পারে না। এটি ৯ তারিখ। মিসরের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত মাহমুদ পাশা ফালাকী গাণিতিক যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মতারিখ ৫৭১ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল মোতাবেক ৯ রবিউল আউয়াল সোমবার।

পিতার মৃত্যু : রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মের দু'মাস পূর্বে তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইন্তিকাল করেন। আবদুল্লাহ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সিরিয়া যান। পথিমধ্যে রোগাক্রান্ত হয়ে মদিনায় নানার বংশ বনী নাজ্জারে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। তার দু'মাস পরে রাসূলুল্লাহ (স) জন্মগ্রহণ করেন। আবদুল মুত্তালিব কাবা গৃহে বসে কুরাইশ দলপতিদের সাথে কথা বলছিলেন। এ সময় সংবাদ আসল, তাঁর পুত্রবধূ আমেনা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছেন। তিনি অনতিবিলম্বে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করে শিশু পৌত্রকে কোলে তুলে নেন এবং সে অবস্থায় কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সরাসরি আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্য দোয়া করেন।

আকিকা ও নামকরণ : রাসূল (স)-এর জন্মের সপ্তমদিনে আবদুল মুত্তালিব আরবের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজনকে আকিকার উৎসবে দাওয়াত দেন। আহারাদি সমাপন করে কুরাইশ প্রধানগণ আবদুল মুত্তালিবকে শিশুর নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দেন 'মুহাম্মাদ' অর্থ– পরম প্রশংসিত। সমবেত স্বজনগণ এ অভিনব নাম শুনে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলতে লাগলেন, মুহাম্মাদ! এমন নাম তো আমরা আর কখনো শুনিনি। আপনি স্বগোত্রের প্রচলিত সব নাম পরিত্যাগ করে এ অভিনব নাম রাখলেন কেন? আবদুল মুত্তালিব উত্তর দিলেন, "আমি চাই আমার এ সন্তানটি যুগে যুগে পৃথিবীর সর্বত্র প্রশংসিত হোক, তাই আমি তাঁর এ নাম রেখেছি।"

বিবি আমেনা গর্ভাবস্থায় যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সে অনুসারে পুত্রের নাম রাখেন 'আহমদ' অর্থাৎ পরম প্রশংসাকারী। মুহাম্মাদ ও আহমদ উভয় নামই বাল্যকাল থেকে প্রচলিত ছিল। এক নামে তিনি 'মুহাম্মাদ' অন্য নামে 'আহমদ' অর্থাৎ, একদিকে তিনি পরম প্রশংসিত, অপরদিকে পরম প্রশংসাকারী। কুরআন মাজিদে রাসূল (স)-এর দুটি নামেরই উল্লেখ আছে।

ধাত্রীগৃহে মুহাম্মাদ (স) : শিশু মুহাম্মাদ (স) জন্মের পর প্রথম দু'তিন দিন মাতৃদুগ্ধ পান করেন। তার পর আবু লাহাবের সুওয়াইবা নামের দাসী তাঁকে দুগ্ধ পান করান। জন্মের দুই সপ্তাহ পরেই মরুভূমি থেকে বেদুইন ধাত্রীরা শিশু সন্তানের খোঁজে মক্কা নগরীতে উপস্থিত হন। সম্ভ্রান্ত পরিবারে কোনো শিশু জন্ম নিলে তার স্তন্যদান ও লালনপালনের ভার ধাত্রীর ওপর ন্যস্ত হতো। অবশ্য এজন্য ধাত্রীমাতা যথাযথ পুরস্কার ও সম্মানী পেত।

প্রথানুযায়ী ধাত্রীব্যবসায়ী বেদুইন রমণীরা প্রতিপাল্য শিশু সন্তানের সন্ধানে মাঝে মাঝে শহরে আসত। ধনী পরিবারের শিশুদের প্রতিই তাদের অধিকতর আকর্ষণ ও লক্ষ্য থাকত। এজন্য ধাত্রীদের মধ্যে প্রথমত কেউই বিধবা আমেনার পুত্রকে গ্রহণ করতে রাজি হয় নি। অপরদিকে হালিমা নামের ধাত্রী যে বাহনে মক্কায় এসেছিলেন, তা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। তাই অন্যান্য ধাত্রীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনি এক সাথে মক্কা নগরীতে পৌঁছতে পারেন নি।

তাই হালিমা ধনী পরিবারের সন্তান পান নি। তখন হালিমা স্বামীকে বললেন, শূন্য হাতে ফিরে গিয়ে লাভ কি? এ এতিম শিশুটিকেই গ্রহণ করি? স্বামী বললেন– "নিশ্চয়ই! মুহাম্মাদকেই গ্রহণ কর। হয়তো তাঁর মধ্য দিয়েই আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে।" হালিমা তখন শিশু মুহাম্মাদকেই গ্রহণ করলেন।

হালিমা ছিলেন সাদ গোত্রের মহিলা। তখনকার আরবে সাদ বংশের লোকেরা বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল আরবি ভাষায় কথা বলার জন্য বিখ্যাত ছিল। শহরের ভাষা নানা ধারার সংমিশ্রণে বিকৃত হয়ে পড়েছিল এবং বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল আরবি ভাষা এ গোত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে মুহাম্মাদ (স)-এর লালনপালনের ভার এ মার্জিত রুচিবোধসম্পন্ন, উন্নতমনা, বিশুদ্ধভাষী বংশের হাতে গিয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "আমি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছি এবং সাদ গোত্রে প্রতিপালিত হয়ে তাদের বিশুদ্ধ ভাষা আয়ত্ত করেছি, এজন্যই আমি তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী।"

শৈশব : শৈশবে রাসূল (স)-কে অপরাপর শিশু থেকে আকারে একটু বেশি বড় মনে হতো। তাঁর শারীরিক বৃদ্ধি সম্পর্কে হালিমা বলেন, অন্যান্য শিশু এক মাসে যে পরিমাণ বর্ধিত হতো, মুহাম্মাদ (স) একদিনে সে পরিমাণ বর্ধিত হতেন। আর অন্যান্য শিশু এক বছরে যে পরিমাণ বর্ধিত হতো, রাসূল (স) এক মাসে সে পরিমাণ বর্ধিত হতেন।

দুধপানের দু'বছর পার হওয়ার সাথে সাথে প্রথানুযায়ী হালিমা মুহাম্মাদ (স)-কে আমেনার নিকট নিয়ে আসেন। আমেনা পুত্রের স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য ও দিব্যকান্তি দেখে মুগ্ধ হন। এ সময় মক্কায় সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। এ কারণে আমেনা আরো কিছুদিন মুহাম্মাদ (স)-কে হালিমার তত্ত্বাবধানে রাখা সঙ্গত মনে করলেন। আবদুল মুত্তালিবও বিষয়টি বিবেচনা করেন। তাই আরো কিছু দিন রাসূল (স)-কে ধাত্রীমাতা হালিমার তত্ত্বাবধানে থাকতে হয়।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশু মুহাম্মাদ (স)-এর সামাজিক বিভিন্ন দিক ও বিভাগে কিছু কিছু জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ ঘটতে থাকে। তিনি একদিন দুধমাতার নিকট জানতে চাইলেন, আমার ভাই আবদুল্লাহ সারাদিন কোথায় থাকে? হালিমা বলল, "তারা দিনে মাঠে মেষ চরাতে যায়।" তখন শিশু মুহাম্মাদ (স) বললেন, "আমিও তাদের সাথে মাঠে মেষ চরাতে যাব।" হালিমা তাকে নিষেধ করেন, তবুও তিনি বার বার বলায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে অনুমতি দেন। তার পর থেকে তিনি মাঝে মধ্যে তাঁর দুধভাই আবদুল্লাহর সাথে মেষ চরাতে যেতেন।

মেষ বা বকরি চরানো একটি জটিল বিরক্তিকর কাজ। এ কারণেই অনেক নবী-রাসূলের জীবনেই মেষ পালনের ঘটনা ঘটেছে। উন্মুক্ত নীল আকাশের নিচে বিশাল প্রান্তরে একপাল মেষ আর একজন চালক। কোনো মেষ যাতে অপরের শষ্যক্ষেত্র নষ্ট না করে, হারিয়ে না যায়, বাঘে না ধরে, অথচ প্রত্যেকে উপযুক্ত আহার পেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে সন্ধ্যাকালে প্রভুর গৃহে নির্বিঘ্নে ফিরে আসে, এটাই মেষ পালকের প্রধান কাজ। তেমনি একজন নবী রাসূল জাতির পরিচালক। মেষচালকের ন্যায় তিনি মানুষচালক। এ দায়িত্ব ভালোভাবে অনুধাবনের জন্য নবী-রাসূলদের মেষ পালন ও চরানো ঐতিহ্যগতভাবে স্বীকৃত।

বক্ষবিদারণ : হালিমার গৃহে অবস্থানকালে চার বছর বয়সে মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। একদিন শিশু মুহাম্মাদ (স) তাঁর দুধভাই ও অন্যান্য বালকদের সাথে মাঠে মেষ চরাতে গিয়েছিলেন। এমন সময় সাদা কাপড় পরিহিত দু'জন লোক আবির্ভূত হয়ে মুহাম্মাদ (স)-এর হাত ধরে একটু আড়ালে নিয়ে যায়। তাঁকে চিৎ করে শুইয়ে বুক চিরে হৃৎপিণ্ড বাইরে আনে। একটি সোনার তশতরিতে রেখে যমযমের পবিত্র পানি দিয়ে তারা তা ধৌত করে। অতঃপর তাঁর উভয় কাঁধের মাঝে মহরে নবুয়াত স্থাপন করে অদৃশ্য হয়ে যায়।

মুহাম্মাদ (স) সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকেন। তাঁর দুধভাই দূর থেকে ব্যাপারটি লক্ষ করে ভয়ে দৌড়ে গিয়ে হালিমাকে ব্যাপারটা জানায়। সংবাদ শুনে হালিমা ও তাঁর স্বামী ছুটে এসে দেখেন, মুহাম্মাদ (স) বিবর্ণ হয়ে পড়ে আছেন। তাঁরা কিছুই বুঝতে পারলেন না। সেবাশুশ্রূষা করে উভয়ে মুহাম্মাদ (স)-কে গৃহে নিয়ে আসেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা) বলেন, "আমি মহানবী (স)-এর বুকে সেলাইয়ের চিহ্ন দেখতে পেতাম।"

মাতৃকোলে : এ ঘটনায় হালিমা ও তাঁর স্বামী অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং মুহাম্মাদ (স)-কে মায়ের কোলে পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যখন তাঁকে মক্কায় তাঁর মায়ের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আমেনা জিজ্ঞেস করেন– এত আগ্রহ উৎসাহে নিয়ে যাওয়ার পর এত তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনার কারণ কী? বার বার জিজ্ঞাসার পর হালিমা আসল ঘটনা খুলে বলেন। তখন আমেনা বললেন, "নিশ্চয় আমার এ সন্তানের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।" এ কথা বলে হযরত আমেনা গর্ভাবস্থা এবং জন্মের সময়কার বিস্ময়কর ঘটনাবলি তাদের শোনান এবং মুহাম্মাদ (স)-কে নিজের কাছে রেখে দেন।

মায়ের ইন্তিকাল : হালিমার কাছ থেকে আসার পর ষষ্ঠ বছরে শিশু মুহাম্মাদকে নিয়ে মা আমেনা মদিনায় গিয়ে পিতৃকুলের সঙ্গে রাসূলের সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং স্বামীর কবর যিয়ারত করার ইচ্ছা করেন। এজন্য উম্মে আয়মান নামের পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে মদিনা যাত্রা করেন। মদিনায় পৌঁছে আমেনা শিশু মুহাম্মাদ (স)-কে সঙ্গে নিয়ে তাঁর স্বামীর কবর যিয়ারত করেন। একমাস পিতৃগৃহে কাটিয়ে তিনি পুনরায় মুহাম্মাদ (স)-কে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসার জন্য যাত্রা করলেন। তিনি যখন মক্কা মদিনার মধ্যবর্তী 'আবওয়া' নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন হঠাৎ সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

উম্মে আয়মান আমেনাকে সেখানে কবর দিয়ে মুহাম্মাদ (স)-কে সাথে করে মক্কায় ফিরে আসেন। এবার মুহাম্মাদ (স)-এর লালনপালনের ভার পরিচারিকা উম্মে আয়মানের ওপর পড়ে। আর অভিভাবকত্বের দায়িত্ব আসে দাদা আবদুল মুত্তালিবের ওপর। আবদুল মুত্তালিব তাঁর এ নাতিকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। সবসময় তাঁকে সঙ্গে রাখতেন। আদর স্নেহে নাতিকে মাতাপিতার শূন্যতা কখনোই বুঝতে দিতেন না। তাঁকে নিয়ে তিনি অত্যধিক গর্ব করতেন এবং লোকজনকে তাঁর মর্যাদার কথা বলতেন। ঐতিহাসিক ও ইসলামি চিন্তাবিদদের মতে মোট চার বার রাসূল (স)-এর বক্ষবিদারণ হয়। ১. হালিমার গৃহে অবস্থানকালে চার বছর বয়সে, ২. দশ বছর বয়সে ৩. হেরা পর্বতের গুহায় জিবরাঈলের সাথে কথোপকথনের সময় এবং ৪. মিরাজের রাতে।

শিক্ষা : আরবদেশে সে সময় লেখাপড়া শেখা এবং শেখানোর তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। লেখাপড়া শেখার স্বীকৃত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও তখন গড়ে ওঠেনি। তাই সমাজের অন্য সবার মতো নবী করীম (স)ও নিরক্ষর ছিলেন। আল কুরআনের ২১ পারা ১ম রুকূর সূরা আনকাবুতে তা বিবৃত হয়েছে।

রাসূল (স)-এর শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। এ জন্যই তিনি পৃথিবীর সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। নবুয়ত হলো তাঁর শিক্ষা; আর আল্লাহ তাআলা হলেন তাঁর শিক্ষক। জ্ঞানের এমন তথ্য তিনি প্রচার করেন; এমন অজ্ঞাতপূর্ব সত্য জগতের সম্মুখে উপস্থাপন করেন, যা দেখে শুনে জগদ্বাসী স্তম্ভিত হয়। যুগে যুগে জ্ঞান গবেষণা যতই বৃদ্ধি পাবে, সে সকল অজ্ঞাতপূর্ব, পূর্ব অচিন্তনীয় তথ্যের সত্যতা ও গুরুত্ব ততই অধিক উপলব্ধি হতে থাকবে। এক অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশে, কুসংস্কারপূর্ণ মূর্খ জাতির মধ্য থেকে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, দেশ শাসন ও প্রজা পালন, যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি, দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদি জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগে এমন সুন্দরভাবে নিজের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা সারা দুনিয়া আজ পর্যন্ত তার একটির সাথেও চ্যালেঞ্জ করতে পারে নি।

আল আমীন উপাধি

বাল্যকাল থেকেই রাসূলুল্লাহ (স) দুর্দশাগ্রস্ত ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি সংবেদনশীল ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। নম্রতা, বিনয়, সত্যবাদিতা, সাধুতা ও সৎস্বভাবের জন্য আরববাসী তাঁকে আল আমীন বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করেন। অবশেষে 'মুহাম্মাদ' (স) নামের পরিবর্তে আল আমীন নামই বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে।

খাদিজাকে বিয়ের সুফল

১. খাদিজাকে বিয়ের পর পরই তাঁর সকল সম্পদ রাসূল (স)-কে দান করে দেন। যুবক মুহাম্মাদ (স) দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পান। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তাআলা আল কুরআনে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করে বলেন– وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَاَغْنٰى অর্থাৎ, তিনি আপনাকে নিঃস্ব পেলেন; অতঃপর ধনী করলেন।

২. খাদিজা (রা) স্বামী বিয়োগের পর দীর্ঘদিন নিঃসঙ্গ ছিলেন। তাঁর পিতামাতাও জীবিত ছিলেন না। এ বিয়ের ফলে তিনি একজন অভিজ্ঞ অভিভাবক পেলেন, যদিও তিনি তাঁর তুলনায় বয়সে ছোট ছিলেন।

৩. মুহাম্মাদ (স) দরিদ্র ও নিঃস্ব ছিলেন বলে সমাজে অনেকে তাঁকে হেয় মনে করতো। বিশেষত তিনি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় কেউ কেউ তাঁকে আগে থেকেই ভিন্ন চোখে দেখত। বিরাট ধনৈশ্বর্যের অধিকারিণী খাদিজা (রা)-কে বিয়ের পর তাঁর সামাজিক মর্যাদা বেড়ে যায়।

৪. রাসূল (স)-এর বংশ বনু হাশিম ছিল অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত। যদিও রাসূল (স) গরিব ছিলেন। বিশেষত দাদা আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর পরে আবু তালিব বনু হাশেমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে সমধিক পরিচিত ছিলেন। কাবার খাদেম হিসেবে গোটা আরবে হাশেমি বংশের আলাদা একটা মর্যাদা ছিল। এ বিয়ের ফলে বিবি খাদিজা (রা)-এর বংশেরও সামাজিক মর্যাদা অনেকখানি বেড়ে যায়।

৫. এ বিয়ের ফলে যে অর্থসম্পদ মহানবী (স)-এর হাতে আসে, তা দিয়ে যেমন সমাজের দুস্থ মানুষ উপকৃত হয়, তেমনি পরবর্তীতে ইসলামের প্রচার প্রসারে সহায়ক হয়।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিয়ে তাঁর রিসালাত জীবনের আয়োজন মাত্র। একাধিক কারণে তাঁর জীবনে বিবি খাদিজার সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, তাই আল্লাহ এ মিলন ঘটিয়ে দিয়েছেন। এ মিলন যতটা না দৈহিক, তার চেয়ে অনেক বেশি আত্মিক। এর মধ্যে এক অপার্থিব রহস্য নিহিত ছিল। দু'একদিন নয়, রাসূল (স) সুদীর্ঘ ২৫ বছর খাদিজার সঙ্গে বৈবাহিক জীবন কাটিয়েছেন। ঐতিহাসিকগণ রাসূলের এ বিয়ে তাঁর জীবনের অন্যতম মুজিযা ও বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন।

তিরোধান : রাসূলুল্লাহ (স) ৮ জুন ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে শাহাদাতবরণ করেন। মসজিদে নববীর সবুজ গম্বুজের নিচে তাঁকে সমাধীস্থ করা হয়।

সমাপনী : রাসূল (স) আমাদের অনুপম আদর্শ। আমাদের সামাজিক পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে রাসূল (স) এর আদর্শ অনুসরণ করলে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে শান্তি বয়ে আনবে। তাই আমাদের উচিত রাসূল (স) এর জীবনী অনুশীলন করা।

বিষয় : দিরাসাতুত তাফসির ও উসুলিহি (সপ্তম পত্র)

বিষয় কোড : 611107

এসাইনমেন্টের শিরোনাম : তাফসিরে কাশশাফ/বায়যাভি (র) এর উপর আলোচনা।

শিক্ষার্থীর নাম	:	শিক্ষকের নাম	: .....
শ্রেণি	:	শিক্ষকের স্বাক্ষর	: .....
রেজি নং	:	পদবি	: .....
রোল নং	:	তারিখ	: .....
বিভাগ	:	মূল্যায়ন	: .....
সেশন	:		
পরীক্ষার বছর	:		
পর্ব	:		

সমাধান : তাফসিরে কাশশাফ পরিচিতি : আল্লামা যামাখশারি কর্তৃক রচিত আল-কুরআনের তাফসির গ্রন্থের নাম 'তাফসিরে কাশশাফ'। তবে এ গ্রন্থের পূর্ণ নাম হলো– اَلْكَشَّافُ عَنْ حَقَائِقِ التَّنْزِيْلِ وَعُيُوْنِ الْأَقَاوِيْلِ فِيْ وُجُوْهِ التَّأْوِيْلِ

রচনাকাল

আল্লামা যামাখশারি দ্বিতীয়বার মক্কায় অবস্থানকালে ৫২৬ হিজরিতে আল কাশশাফ রচনা শুরু করেন। মাত্র দুবছরেই অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনা এবং একনিষ্ঠতার কারণে তিনি এ তাফসির গ্রন্থটি রচনার কাজ সম্পন্ন করেন। তিনি ৫২৮ হিজরি ২৩ রবিউল আউয়াল/১১৩৪ খ্রিষ্টাব্দে দারে সুলাইমানি নামক স্থানে এ গ্রন্থ লেখা সমাপ্ত করেন।

তাফসিরে কাশশাফ প্রণয়নের কারণ : আল্লামা যামাখশারি তার জীবনে যতগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন তাফসিরে কাশশাফ তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মুসলিমবিশ্বে আল্লামা যামাখশারি (র) কাশশাফ গ্রন্থের প্রণেতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি তার উস্তাদ আবু মুদার আদদাব্বি এর প্রেরণায় মুতাযিলা আকিদার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং তার তাফসিরের উস্তাদ আবু সাঈদ আল জাসিমির দ্বারাও প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হন। তিনি মুতাযিলা আকিদাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাফসিরে কাশশাফ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। কাশশাফ গ্রন্থ লেখার কারণ বলতে গিয়ে আল্লামা যামাখশারি তার তাফসিরে কাশশাফ গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন,

رَأَيْتُ اِخْوَانَنَا فِى الدِّيْنَ مِنْ اَفَاضِلِ الْفِئَةِ النَّاجِيَةِ الْعَدْلِيَّةِ الْجَامِعِيْنَ بَيْنَ عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْأُصُوْلِ الدِّيْنِيَّةِ كُلَّمَا رَجَعُوْا اِلَىَّ فِىْ تَفْسِيْرِ اٰيَةٍ فَاَبْرَزْتُ لَهُمْ بَعْضَ الْحَقَائِقِ مِنَ الْحُجُبِ أَفَاضُوْا فِى الْاِسْتِحْسَانِ وَالتَّعَجُّبِ وَاسْتَطِيْرُوْا وَشَوْقًا اِلٰى مُصَنَّفٍ يَضُمُّ اَطْرَافًا مِنْ ذَالِكَ حَتَّى اجْتَمَعُوْا اِلَىَّ مُقْتَرِحِيْنَ اَنْ أُمْلِىَ عَلَيْهِمُ (الْكَشْفَ عَنْ حَقَائِقِ التَّنْزِيْلِ وَعُيُوْنِ الْاَقَاوِيْلِ فِىْ وُجُوْهِ التَّأْوِيْلِ) فَاسْتَعْفَيْتُ فَاَبَوْا اِلَّا الْمُرَاجَعَةَ وَالْاِسْتِشْفَاعَ بِعُظَمَاءِ الدِّيْنِ وَعُلَمَاءِ الْعَدْلِ وَالتَّوْحِيْدِ وَالَّذِىْ حَدَانِىْ عَلَى الْاِسْتِعْفَاءِ عَلٰى عِلْمِىْ اَنَّهُمْ طَلَبُوْا مَا الْاِجَابَةُ اِلَيْهِ عَلَيَّ وَاجِبَةٌ لِاَنَّ الْخَوْضَ فِيْهِ كَفَرْضِ الْعَيْنِ.

মক্কায় মুতাযিলা মতবাদের সমর্থনে কুরআনের ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় তিনি তাফসিরে কাশশাফ লেখার জন্য উদ্বুদ্ধ হন। তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতা আকর্ষণীয় বিধায় মক্কার লোকেরা তাঁকে কুরআনের তাফসির লিখে আল কাশশাফ নামকরণের পরামর্শ প্রদান করেন। প্রথমে তাঁদের প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। কিন্তু অবশেষে তাদের অনুরোধে তিনি তাফসিরের এ নাম দিতেই সম্মত হন।

অপূর্ব শব্দ চয়ন এবং ভাষার অলঙ্কারপূর্ণ ব্যবহার এবং অসাধারণ মাধুর্যতার কারণে গ্রন্থটি গুণীজন দ্বারা প্রশংসিত ও সমাদৃত। আল কাশশাফ গ্রন্থের প্রশংসায় তিনিই নিজেই বলেন।

إِنَّ التَّفَاسِيْرَ فِى الدُّنْيَا بِلَا عَدَدٍ * وَلَيْسَ فِيْهَا لَعُمْرِىْ مِثْلَ كَشَّافِىْ
إِنْ كُنْتَ تَبْغِى الْهُدٰى فَاَلْزِمْ قِرَاءَتَهٗ * فَالْجَهْلُ كَالدَّاءِ وَالْكَشَّافُ كَالشَّافِىْ

অর্থাৎ, দুনিয়াতে অসংখ্য তাফসির গ্রন্থ রয়েছে। আমার জীবনের কসম, আমার কাশশাফের মতো একটিও নেই। যদি তুমি হিদায়াত চাও তবে এটি অধ্যয়ন করা অপরিহার্য করে নাও। কেননা, মূর্খতা হলো রোগ আর কাশশাফ হলো তার আরোগ্যদানকারী।

তাফসিরে কাশশাফ প্রণয়নের কারণ : আল্লামা যামাখশারি তার জীবনের যতগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন তাফসিরে কাশশাফ তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মুসলিমবিশ্বে আল্লামা যামাখশারি কাশশাফ গ্রন্থপ্রণেতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি তার উস্তাদ আবু মুদার আদদাব্বির প্রেরণায় মুতাযিলা আকিদার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং তার তাফসিরের উস্তাদ আবু সাঈদ আল জাসিমির দ্বারাও প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হন। তিনি মুতাযিলা আকিদাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাফসিরে কাশশাফ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। আল্লামা যামাখশারি দ্বিতীয়বার মক্কায় অবস্থানকালে ৫২৬ হিজরিতে আল কাশশাফ রচনা শুরু করেন। মাত্র দুবছরেই অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনা এবং একনিষ্ঠতার কারণে তিনি এ তাফসির গ্রন্থটি রচনার কাজ সম্পন্ন করেন। তিনি ৫২৮ হিজরি ২৩ রবিউল আউয়াল/১১৩৪ খ্রিষ্টাব্দে দারে সুলাইমানি নামক স্থানে এ গ্রন্থ লিখা সমাপ্ত করেন।

কাশশাফ গ্রন্থ লেখার কারণ বলতে গিয়ে আল্লামা যামাখশারি তার তাফসিরে কাশশাফ গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন :

رَأَيْتُ اِخْوَانَنَا فِى الدِّيْنَ مِنْ اَفَاضِلِ الْفِئَةِ النَّاجِيَةِ الْعَدْلِيَّةِ الْجَامِعِيْنَ بَيْنَ عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ وَ الْأُصُوْلِ الدِّيْنِيَّةِ كُلَّمَا رَجَعُوْا اِلَىَّ فِىْ تَفْسِيْرِ اٰيَةٍ فَاَبْرَزْتُ لَهُمْ بَعْضَ الْحَقَائِقِ مِنَ الْحُجُبِ، أَفَاضُوْا فِى الْاِسْتِحْسَانِ وَالتَّعَجُّبِ وَاسْتَطَارُوْا شَوْقًا اِلَى مُصَنَّفٍ يَضُمُّ اَطْرَافًا مِنْ ذٰلِكَ حَتَّى اجْتَمَعُوْا اِلَىَّ مُقْتَرِحِيْنَ اَنْ أُمْلِىَ عَلَيْهِمُ الْكَشْفَ عَنْ حَقَائِقِ التَّنْزِيْلِ وَعُيُوْنِ الْاَقَاوِيْلِ فِى وُجُوْهِ التَّأْوِيْلِ فَاَبَوْا اِلَّا الْمُرَاجَعَةَ وَالْاِسْتِشْفَاعَ بِعُظَمَاءِ الدِّيْنِ وَعُلَمَاءِ الْعَدْلِ وَالتَّوْحِيْدِ، وَالَّذِىْ حَدَانِىْ عَلَى الْاِسْتِغْفَاءِ عَلَى عِلْمِىْ اَنَّهُمْ طَلَبُوْا مَا الْاِجَابَةُ اَلَيْهِ عَلَىَّ وَاجِبَةٌ لِاَنَّ الْخَوْضَ فِيْهِ كَفَرْضِ الْعَيْنِ.

মক্কায় মুতাযিলা মতবাদের সমর্থনে কুরআনের ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় তিনি তাফসিরে কাশশাফ লেখার জন্য উদ্বুদ্ধ হন। তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতা আকর্ষণীয় বিধায় মক্কার লোকেরা তাঁকে কুরআনের তাফসির লিখে আল কাশশাফ নামকরণের পরামর্শ প্রদান করেন। প্রথমে তাঁদের প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। কিন্তু অবশেষে তাদের অনুরোধে তিনি তাফসিরের এ নাম দিতেই সম্মত হন।

আল্লামা যামাখশারি ধারণা করেছিলেন যে, এ গ্রন্থ শেষ করতে তাঁর প্রায় ত্রিশ বছর সময় প্রয়োজন হবে। কিন্তু তার নিরলস প্রচেষ্টা ও সাধনা এবং একনিষ্ঠ পরিশ্রমের ফলে মাত্র দুবছরেই তিনি এ কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হন। তিনি মনে করেন যে, পবিত্র কাবা ঘরের বরকতের কারণেই এ রকম একটি কঠিন কাজ এত কম সময়ে সম্পন্ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এ গ্রন্থে তিনি কুরআনের ব্যাকরণ ও আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। অপূর্ব শব্দ চয়ন এবং ভাষার অলঙ্কারপূর্ণ ব্যবহার এবং অসাধারণ মাধুর্যতার কারণে গ্রন্থটি গুণীজন দ্বারা প্রশংসিত ও সমাদৃত। আল কাশশাফ গ্রন্থের প্রশংসায় তিনি নিজেই বলেন,

إِنَّ التَّفَاسِيْرَ فِى الدُّنْيَا بِلَاعَدَدٍ * وَلَيْسَ فِيْهَا لَعُمْرِىْ مِثْلَ كَشَّافِىْ

إِنْ كُنْتَ تَبْغِى الْهُدٰى فَاَلْزِمْ قِرَاءَتَهٗ * فَالْجَهْلُ كَالدَّاءِ وَالْكَشَّافُ كَالشَّافِىْ

অর্থাৎ, দুনিয়াতে অসংখ্য তাফসির গ্রন্থ রয়েছে। আমার জীবনের কসম, আমার কাশশাফের মতো একটিও নেই। যদি তুমি হিদায়াত চাও তবে এটি অধ্যয়ন করা অপরিহার্য করে নাও। কেননা, মূর্খতা হলো রোগ আর কাশশাফ হলো তার আরোগ্যদানকারী।

তাফসিরে কাশশাফে যামাখশারির অনুসৃত পদ্ধতি : তাফসিরে কাশশাফ আল্লামা যামাখশারির অনবদ্য রচনা। এর ভাষাশৈলী, ব্যাকরণগত সূক্ষ্ম আলোচনা, কুরআনের অলঙ্কার উপস্থাপন প্রভৃতি বিষয়ের কারণে তাফসির জগতে এর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে। নিচে তাফসিরে কাশশাফে যামাখশারির অনুসৃত পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

তাফসির পদ্ধতি : আল্লামা যামাখশারি তাফসিরে কাশশাফে কোনো সুরা বা আয়াতের তাফসির করার ক্ষেত্রে নিচে বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন–

১. শুরুতে সুরার নাম, অবতীর্ণ হওয়ার সময় এবং সুরার মোট আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। যেমন– সুরা বাকারার শুরুতে তিনি উল্লেখ করেন– سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ مِائَتَانِ وَسِتٌّ وَثَمَانُوْنَ اٰيَةً.
   অর্থাৎ, সুরা বাকারা হলো মাদানি। এর আয়াত সংখ্যা ২৮৬।
   এরপর সুরার কিছু আয়াত একত্রে উল্লেখ করে, তার অর্থ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন।
২. আয়াতের অন্তর্ভুক্ত শব্দাবলির ভাষা ও ইরাবগত আলোচনা উপস্থাপন করেন।
৩. আয়াতের শানে নুযুল তথা অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট উল্লেখ করেন।

৪.তাফসিরে কাশশাফের তথ্যসূত্র : আল্লামা যামাখশারি তাফসিরে কাশশাফে বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি এবং তথ্য উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি ভাষা ও নাহুর ক্ষেত্রে ইমাম সিবওয়াইহি (র) এর 'আল-কিতাব', আবু আলি আল-ফারিসি (র) এর 'আল-হালাবিয়াত' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছেন। ইলমুল কিরাতের ক্ষেত্রে তিনি মুসহাফে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, মুসহাফে উবাই ইবনে কাবের উপর নির্ভর করেছেন। তাফসিরের ক্ষেত্রে তাফসিরে মুজাহিদ এবং কুরআনের অর্থ ও ইরাবের ক্ষেত্রে ইমাম যুজাজ (র)-এর مَعَانِي الْقُرْاٰنِ وَإِعْرَابُهُ গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছেন।

৫.বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা উপস্থাপন : আল্লামা যামাখশারি 'তাফসিরে কাশশাফ' এ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি তাফসির, ফিকহ, আকিদা, সাহিত্য, বিভিন্ন ঘটনা, নাহু, ভাষা, অলংকার প্রভৃতি বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা তাফসিরে কাশশাফের মধ্যে উপস্থাপন করেছেন। তিনি وَمِنْ هُنَا نَسْتَنْبِطُ بِأَنَّ هٰذَا التَّفْسِيْرَ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, مِنَ التَّفْسِيْرِ عَلَى بَيَانِ الدَّقِيْقِ وَلَيْسَ عَلَى بَيَانِ التَّفْصِيْلِيِّ অর্থাৎ এ আয়াত থেকে আমরা উদ্ভাবন করেছি যে, এই তাফসির হলো সূক্ষ্ম বিষয়াবলি বর্ণনার তাফসির, বিস্তারিত বিবরণের তাফসির নয়।

৬.ভাষাগত বিবরণ উল্লেখ : আল্লামা যামাখশারি তাঁর তাফসিরে ভাষাগত নানা জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন আয়াতের তাফসিরে কিরাত, ভাষাগত বিষয়, নাহু, সরফ প্রভৃতি বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। তিনি কুরআনের বালাগাত তথা অলঙ্কারের বিষয়সমূহ উল্লেখ করেছেন। আয়াতের রূপক, সাদৃশ্য, বাক্যশৈলী, উপমা প্রভৃতি বিষয় সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করেছেন। মাঝে মাঝে তিনি মনীষীদের বক্তব্য ও কবিতা থেকেও প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

৭.ফিকহ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন : তাফসিরের ক্ষেত্রে যামাখশারির অন্যতম পদ্ধতি ছিল, তিনি আহকাম সংক্রান্ত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় ফিকহবিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করেন। তিনি ফিকহের মাসয়ালার ক্ষেত্রে ইমাম আযম আবু হানিফা (র) এর মাযহাবকে অনুসরণ করতেন।

৮.আকিদা সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন : আকিদাগত আলোচনার ক্ষেত্রে আল্লামা যামাখশারি মুতাযিলি আকিদা উপস্থাপন করেছেন। তিনি মুতাযিলি মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাফসিরে কাশশাফ প্রণয়ন করেন। এটি মুতাযিলি আকিদা সংবলিত কুরআনের একটি তাফসির গ্রন্থ। তিনি মুতাযিলা আকিদা এবং মুতাযিলাদের পঞ্চ মূলনীতির আলোকে এ তাফসির গ্রন্থ রচনা করেন। উল্লেখ্য যে, মুতাযিলাদের পঞ্চ মূলনীতি হলো–

১. اَلتَّوْحِيْدُ তথা একত্ববা`

২. اَلْعَدْلُ তথা ন্যায়বিচার।

৩. اَلْوَعْدُ وَالْوَعِيْدُ তথা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ভীতিপ্রদর্শন।

৪. اَلْمَنْزِلَةُ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ তথা দুই অবস্থানের মধ্যবর্তী এক অবস্থান।

৫. اَلْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ তথা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ।

তাফসিরে বায়যাবি গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য : তাফসিরে বায়যাবি যুযোপযোগী একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী তাফসির গ্রন্থ। নিচে এ তাফসিরের বৈশিষ্ট্যাবলি আলোচনা করা হলো।

১. **সংক্ষিপ্ত তাফসির :** তাফসিরে বায়যাবি তাফসিরে কাশশাফ হতে সংক্ষেপ করে এবং মুতাযেলি আকিদা বিদূরিত করে রচনা করা হয়েছে। এতে অতিরিক্ত বর্ণনা কিংবা কাহিনীমূলক বিবরণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হয়েছে।

২. **ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ :** আল্লামা বায়যাবি (র) তাফসিরে বায়যাবিতে আকলি ও নকলি দলিল, ইতিহাস, দর্শন, হিকমত ইত্যাদির মাধ্যমে তাসাউফে বাতেলা ও আকাইদে কালেদা (ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস)-এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।

৩. **বহুশাস্ত্রের সমাহার :** বায়যাবি শরিফ কেবলমাত্র তাফসির শাস্ত্র নয়; বরং তাতে নাহু, সরফ, হিকমত, ইতিহাস, দর্শন, বালাগাত ইত্যাদি শাস্ত্রের ব্যাপারেও তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে।

৪. **ব্যাকরণগত আলোচনা :** তাফসিরে বায়যাবিতে ব্যাকরণগত দুর্বোধ্য বিষয়সমূহ সুন্দর ও সাবলিল ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি তারকিব ও মহল্লে ইরাব সম্পর্কেও নিখুঁত আলোচনা করা হয়েছে।

৫. **বিরল উপস্থাপনা :** আল্লামা বায়যাবি (র) বক্তব্যকে সহজবোধ্য করার নিমিত্তে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়কে উদ্ভাবিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রশ্নাকারে আলোচনা করে তার যথাযথ সমাধান লিখেছেন। এ ধরনের উপস্থাপনা সত্যিই বিরল।

৬. **জ্ঞানভাণ্ডার :** বায়যাবি শরিফ বিভিন্ন জ্ঞানের একটি ভাণ্ডার স্বরূপ। এতে ইলমে নাহু, ইলমে সরফ, ইলমে মায়ানি, ইলমে বালাগাত ইত্যাদি শাস্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ফলে এটি একটি জ্ঞানভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে।

৭. **শাব্দিক বিশ্লেষণ :** বায়যাবি শরিফে কুরআন মাজিদের কঠিন শব্দাবলির বুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ ও গঠনধারা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে আলোচনা করেছেন। তিনি শব্দের উৎপত্তি ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আয়াত, হাদিস ও কবিদের কবিতা প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেছেন।

৮. **কিরায়াত ও পঠনরীতি প্রসঙ্গে আলোচনা :** বায়যাবি শরিফে কুরআন মাজিদের বিভিন্ন কিরাত ও পঠনরীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। যার ফলে এ তাফসির গ্রন্থটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে।

৯. **তাহরিফ মুক্ত :** বায়যাবি শরিফের কোথাও কোনো তাহরিফ নেই; বরং নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন মতামত তুলে ধরা হয়েছে এবং যথাযথ উত্তর প্রদান করা হয়েছে।

১০. **ফিকহি মাসয়ালার উদ্ভাবন :** বায়যাবি শরিফে তাফসিরের সাথে সাথে আয়াত থেকে ফিকহি কী কী মাসয়ালা উদ্ভাবিত হয় এ প্রসঙ্গেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যা এ গ্রন্থের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

১১. **ইমামদের মাযহাবের আলোচনা :** বায়যাবি শরিফে কুরআন মাজিদের আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে গ্রন্থকার প্রয়োজনবোধে ইমামদের মাযহাব প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। যা প্রশংসার দাবিদার।

১২. **দার্শনিক তত্ত্বের বিবরণ :** বায়যাবি শরিফে দার্শনিক তত্ত্বসমূহ এমন সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যার জন্য একে একটি দর্শনশাস্ত্রের সাথে তুলনা করা যায়।

১৩. **মুতাযেলি আকিদা খণ্ডন :** ইমাম বায়যাবি (র) স্বীয় তাফসির গ্রন্থে মুতাযেলি আকিদাকে জোরালোভাবে বাতিল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

১৪. **ইসরাইলি বর্ণনা :** ইমাম বায়যাবি (র) তুলনামূলকভাবে কম ইসরাইলি বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। যার কারণে কিতাবটির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৫. **বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন বিষয় চয়ন :** ইমাম বায়যাবি (র) তাফসিরে কাশশাফ থেকে ইরাব, মায়ানি, বয়ান-ইত্যাদি গ্রহণ করেছেন। তাফসিরে রাগেব থেকে সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ, শব্দ-বিশ্লেষণ ইত্যাদি গ্রহণ করেছেন। তাফসিরে কাবির থেকে বাক্যের হাকিকত হিকমত গ্রহণ করেছেন। যার ফলে বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ে রচিত তা একটি তুলনাহীন গ্রন্থ। তাই জনৈক কবি বলেছেন–

أُولُوا الْأَلْبَابِ لَمْ يَأْتُوْا ..... بِكَشْفِ قِنَاعِ مَايَتْلٰى
وَلٰكِنْ كَانَ لِلْقَاضِيْ ..... يَدٌ بَيْضَاءُ لَّا تَبْلٰى

সমাপনী : সার্বিক বিচেনায় দেখা যায়, তাফসিরে বায়যাবি একটি যুগশ্রেষ্ঠ তাফসির গ্রন্থ। কেননা, এর মধ্যে এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য কোনো তাফসির গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

বিষয় : আল আকিদাহ আল ইসলামিয়্যাহ (অষ্টম পত্র)

বিষয় কোড : 611108

এসাইনমেন্টের শিরোনাম : আকিদা এর পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ।

শিক্ষার্থীর নাম	:	শিক্ষকের নাম	: .....
শ্রেণি	:	শিক্ষকের স্বাক্ষর	: .....
রেজি নং	:	পদবি	: .....
রোল নং	:	তারিখ	: .....
বিভাগ	:	মূল্যায়ন	: .....
সেশন	:		
পরীক্ষার বছর	:		
পর্ব	:		

সমাধান : ভূমিকা : ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আকিদা। ঈমানের পরেই আকিদার স্থান। ঈমান নির্ভেজাল ও ত্রুটিমুক্ত হওয়ার জন্য আকিদা পরিশুদ্ধ হওয়া শর্ত। সাহাবায়ে কিরামের স্বর্ণযুগ অবসানের পর উমাইয়া শাসনামলে মুসলিম জাহানে নেমে আসে আকিদার বিপর্যয়। মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয় ৭৩ দলের। এর সূচনা হয়ে ছিল হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর থেকে। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে আকিদাগত বিভেদ ও বিভাজন আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে, যা দীনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

اَلْعَقِيْدَةُ-এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ : عَقِيْدَةٌ শব্দটি عَقْدٌ শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন। একবচন, বহুবচনে عَقَائِدُ। এর আভিধানিক অর্থ–

১. বিশ্বাস, ২. মতাদর্শ, ৩. ধর্মমত, ৪. اَلْمَوْرِدُ অভিধানে রয়েছে عَقِيْدَةٌ অর্থ– বিশ্বাস, অবস্থা, ধর্মমত, মতাদর্শ, ৫. قَضِيَّةٌ مُصَدَّقَةٌ যৌক্তিক সিদ্ধান্ত বা ফয়সালা, ৬. عَقَدَ الْبِنَاءُ অর্থ ভিত্তি মজবুত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন– وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ অর্থাৎ, যারা তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করে, তাদেরকে তাদের অধিকার প্রদান কর। (সুরা নিসা- আয়াত- ৩৩) ৭. Article of faith. Doctrine. Creed. Belief. knitting-knotting. contract. Agrement. ৮. যাতে বিশ্বাস করা যায়, নীতি, আদর্শ, বিশ্বাসধর্ম। ৯. দাড়ি বা চুল জাতীয় জিনিসে গিট দেওয়া, ব্যবসা, চুক্তি, শপথ ইত্যাদিকে দৃঢ় করা, নির্মাণকে মজবুত করা, চুক্তি, প্রতিশ্রুতি (আর রায়েদ)

পারিভাষিক সংজ্ঞা : বিভিন্ন মনীষী আকিদার বিভিন্ন সংজ্ঞা পেশ করেছেন। যেমন–

১. সায়্যেদ শরিফ জুরজানি (র) বলেন– اَلْعَقِيْدَةُ مَا يُقْصَدُ فِيْهِ نَفْسُ الْاِعْتِقَادِ دُوْنَ الْعَمَلِ

অর্থাৎ, আকিদা বলা হয়, যাতে আমল ব্যতীত শুধু বিশ্বাসের উদ্দেশ্য করা হয়।

২. আল্লামা সাদ উদ্দিন তাফতাযানি (র) বলেন–

هُوَ عِلْمُ التَّوْحِيْدِ وَالصِّفَاتِ الْمَوْسُوْمُ بِالْكَلَامِ الْمُنْجِيْ عَنْ غَيَاهِبِ الشُّكُوْكِ وَظُلُمَاتِ الْاَوْهَامِ

অর্থাৎ, আকাইদ মহান আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর গুণাবলি বিষয়ক শাস্ত্র, যাকে ইলমুল কালাম করে নামকরণ করা হয়। এ শাস্ত্র মূলত সন্দেহ সংশয়ের ঘোর অন্ধকার এবং ধারণা ও কল্পনার অমানিশা থেকে মুক্তিদানকারী।

৩. আল মাওযুয়াত গ্রন্থ প্রণেতা বলেন– هُوَ عِلْمٌ يُقْتَدَرُ بِهِ عَلٰى اِثْبَاتِ الْعَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ بِاِيْرَادِ الْحُجَجِ عَلَيْهَا وَدَفْعِ الشُّبْهَةِ عَنْهَا

অর্থাৎ, আকাইদ ঐ শাস্ত্রকে বলা হয়, যার দ্বারা দলিল-প্রমাণসহ ধর্মীয় বিধানসমূহ প্রমাণ করা এবং সন্দেহ দূর করা সম্ভব হয়।

৪. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ অভিধান প্রণেতা বলেন– اَلْعَقِيْدَةُ الْحُكْمُ الَّذِيْ لَا يُقْبَلُ الشَّكُّ فِيْهِ لَدٰى مُعْتَقِدِهِ

অর্থাৎ, আকিদা হলো এমন বিশ্বাস বা নির্দেশ, যার বিশ্বাসীর নিকট কোনোরুপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ অভিধানে আরো বলা হয়েছে–

اَلْعَقِيْدَةُ فِى الدِّيْنِ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْاِعْتِقَادُ دُوْنَ الْعَمَلِ لِعَقِيْدَةِ وُجُوْدِ اللّٰهِ وَبِعْثَةِ الرُّسُلِ

অর্থাৎ, দীনের মধ্যে আকিদা হলো, যা আমল ব্যতীত শুধু বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করা হয়। যেমন আল্লাহর অস্তিত্ব ও রাসূলগণের প্রেরণের ব্যাপারে বিশ্বাস।

৫. আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল ফাইউমি (র) বলেন–

اَلْعَقِيْدَةُ مَا يَدِيْنُ الْاِنْسَانُ بِهٖ وَلَهٗ عَقِيْدَةٌ حَسَنَةٌ اَىْ سَالِمَةٌ مِنَ الشَّكِّ

অর্থাৎ মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে, তাকে আকিদা বলা হয়। তার আকিদা ভাল এর অর্থ তার বিশ্বাস সন্দেহমুক্ত।

৬. মোল্লা আলি কারি (র) বলেন– عِلْمُ الْعَقِيْدَةِ এমন জ্ঞান, যাতে এমন সব বিষয়ের আলোচনা করা হয়, যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক।

৭. اَلْاِرْشَادُ اِلٰى صَحِيْحِ الْاِعْتِقَادِ প্রণেতা বলেন– আকিদা হলো اَلْعَبْدُ وَيَدِيْنُ بِهٖ مَا يُصَدِّقُهُ অর্থাৎ, বান্দা যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং ধর্মীয় বিষয় হিসেবে মনে করে।

৮. ড. সালেহ ইবনে ফাওযান (র) বলেন–

اَلْعَقِيْدَةُ الْاِسْلَامِيَّةُ هِىَ الَّتِىْ بَعَثَ اللّٰهُ بِهَا رُسُلَهٗ وَاَنْزَلَ بِهَا كُتُبَهٗ وَاَوْجَبَهَا عَلٰى جَمِيْعِ خَلْقِهِ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ

অর্থাৎ, ইসলামি আকিদা হলো ঐ বিশ্বাস, যা দিয়ে আল্লাহ তাআলা রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। যে প্রসঙ্গে আসমানি কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন এবং যা মানব-দানব সকলের উপর ওয়াজিব করেছেন।

৯. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলেন– اَلْعَقِيْدَةُ هِىَ الْخِصَالُ الَّتِىْ اَخَذَ النَّاسُ وَيُقِيْمُ عَلَيْهِ

অর্থাৎ, আকিদা বলা হয় মানুষের এমন কতিপয় অভ্যাসকে, যা সে গ্রহণ করে এবং সেগুলোর উপর স্থির থাকে ।

১০. ইবনে খালদুন (র) বলেন– এটা জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন এক শাখা, যা মানুষকে এমন যোগ্যতা প্রদান করে, যাতে সে শরিয়তের বর্ণিত আকিদাসমূহ সত্য বলে প্রমাণ করতে পারে এবং বিরোধী মতাদর্শকে যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করতে পারে।

عِلْمُ الْعَقَائِدِ-এর উৎপত্তি ও বিকাশ : ইলমুল আকাইদের ইতিহাস ও বিকাশের পর্যায়।

১. প্রাথমিক যুগ (নবী ও সাহাবাদের যুগ- ১ম হিজরি শতক) : ইসলামের আকিদা ছিল সহজ ও সরল, যা সরাসরি কুরআন ও হাদিস থেকে পাওয়া যেত। নবী কারিম (স) স্বয়ং সাহাবাদের আকিদা শিক্ষা দিতেন, যেমন আল্লাহর একত্ববাদ (তাওহিদ), রিসালাত (নবুয়ত), আখিরাত (পরকাল), তাকদির (পূর্বনির্ধারণ)।

আকিদার মৌলিক বিষয়গুলো সরাসরি কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে বর্ণিত ও নির্ধারিত ছিল, বিতর্ক বা যুক্তিবাদী আলোচনা তখনো প্রয়োজন হয়নি।

২. খিলাফত ও মতবিরোধের সূচনা (১ম-২য় হিজরি শতক) : খলিফাদের যুগে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর মুসলমানদের মধ্যে নানান মতভেদ, মতানৈক্য ও বিভাজনের সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের মধ্যে জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিন নামে দুটি বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তারপর কারবালা প্রান্তরে পরিবার ও আত্মীয়দের ৭২জন সদস্যসহ হযরত হুসাইন (রা) শহীদ হন। এ দুটি ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে নানা দল ও উপদলের সৃষ্টি হয়। যেমন– খারেজি (خَارِجِىٌّ), শিয়া, (شِيْعَةٌ) রাফেযি, (رَافِضِىٌّ) জাবারিয়া, (جَبَرِيَّةٌ) কাদারিয়া, (قَدَرِيَّةٌ) জাহমিয়া, (جَهْمِيَّةٌ) মুরজিয়া (مُرْجِيَّةٌ), আশায়েরা (اَشَاعِرَةٌ) ইত্যাদি। তাদের সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন আকিদা রয়েছে। যার অধিকাংশই সঠিক নয়।

৩. ইলমুল কালাম ও যুক্তিবাদী ধারা (২য়-৩য় হিজরি শতক) : আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন ৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাগদাদে "বায়তুল হিকমা" নামে একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রিক জ্ঞানভাণ্ডার হতে গ্রিক ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। অতঃপর এগুলোকে আরবিতে অনুবাদ করান। তাছাড়া তিনি সংস্কৃতি, ফারসি, সিরীয়, ভারতীয় ইত্যাদি ভাষায় রচিত দর্শনসহ অন্যান্য গ্রন্থাদি আরবিতে অনুবাদ করে সর্বসাধারণের অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন। এতে মুসলিম চিন্তাবিদগণ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বিভিন্ন মতাদর্শে বিভক্ত হয়ে পড়েন। খলিফা মামুন গ্রিকদর্শনে প্রভাবান্বিত হয়ে মুতাযিলা (مُعْتَزِلَةٌ) ধর্মদর্শনের সহযোগিতা শুরু করেন। তার পর খলিফা মুতাসিম এবং ওয়াসিক ও মু'তাযিলা ধর্মমতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাদের সহযোগিতায় মুতাযিলা সম্প্রদায় গ্রিকদর্শনের ভিত্তিতে আল্লাহ, কুরআনসহ ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের ব্যাপারে অবাঞ্ছিত যুক্তিতর্কের অবতারণা করতে থাকে।

তাদের বিপরীতে সুন্নি আকিদার পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন ইমাম আবু হাসান আল-আশআরি (ত. ৩২৪ হিজরি) ও ইমাম আবু মানসুর আল-মাতুরিদি (ত. ৩৩৩ হিজরি)। এ সময় থেকে আকিদার আনুষ্ঠানিক শাস্ত্ররূপে বিকাশ ঘটে, যা পরে "ইলমুল কালাম" নামে পরিচিতি লাভ করে।

৪. আকিদার আনুষ্ঠানিক সংকলন ও স্থিতিশীলতা (৪র্থ হিজরি শতক ও পরবর্তী সময়) : এই যুগে আকিদার মৌলিক বিষয়গুলো গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ করা হয়।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ : – اَلْاِبَانَةُ عَنْ اُصُوْلِ الدِّيَانَةِ ইমাম আবু হাসান আল-আশআরি। كِتَابُ التَّوْحِيْدِ– ইমাম আবু মানসুর আল-মাতুরিদি– اَلْعَقِيْدَةُ الطَّحَاوِيَّةُ।` ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবি। তখন থেকে আকিদা বিষয়ক শিক্ষা মাদরাসাগুলোতে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এটি একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে পরিণত হয়।

৫. আধুনিক যুগ ও সংস্কার প্রচেষ্টা (অটোমান সাম্রাজ্য ও সমসাময়িক যুগ) : ইসলামি আকিদার মৌলিকতা সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন মাদরাসা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এটি পড়ানো হতে থাকে।

১৮শ ও ১৯শ শতকে ইসলামে সংস্কারের নামে কিছু আন্দোলন গড়ে ওঠে, যেমন ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহহাবের (ত. ১২০৬ হিজরি) নেতৃত্বে তাওহিদের পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা। আধুনিক সময়ে আকিদার বিষয়গুলোকে বিজ্ঞান ও সমকালীন দর্শনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা দেখা যায়।

هُوَ اِظْهَارُ الْخُضُوْعِ وَالْقَبُوْلُ لِمَا اَتٰى بِهِ مُحَمَّدٌ (ص)

আকিদা, ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১. عَقِيْدَةٌ : এ শব্দটি عَقْدٌ শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস, আস্থা, মতাদর্শ, ধর্মমত, বিশ্বাসমালা, বাঁধা, চুক্তি করা, Article of faith Bind tie, Confidence. Idealogy ইত্যাদি।

২. اِيْمَانٌ : এ শব্দটি اَمْنٌ শব্দমূল থেকে উদ্ভূত, বাবে اِفْعَالٌ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ– বিশ্বাস স্থাপন করা, আনুগত্য করা, স্বীকৃতি দেয়া, নিরাপত্তা লাভ করা, সত্যায়ন করা, Surrender, Submit ইত্যাদি।

৩. اِسْلَامٌ : এ শব্দটি سِلْمٌ মূল শব্দ থেকে উদ্ভূত, বাবে اِفْعَالٌ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ– আত্মসমর্পণ করা, বিনয়াবনত হওয়া, মেনে নেয়া, আনুগত্য করা, বশ্যতা স্বীকার করা, Surrender, Submit ইত্যাদি।

খ. পারিভাষিক পার্থক্য

১. ইমাম যামাখশারি (র) বলেন– اِنَّ كُلَّ مَا يَكُوْنُ الْاِقْرَارُ بِاللِّسَانِ مِنْ غَيْرِ مُوَاطَأَةِ الْقَلْبِ فَهُوَ اِسْلَامٌ

অর্থাৎ, কলবের সম্পৃক্তা ব্যতীত মৌখিক স্বীকৃতিকে ইসলাম বলে। مَا وَاطَأَ فِيْهِ الْقَلْبُ اللِّسَانَ فَهُوَ اِيْمَانٌ অর্থাৎ, জবানের সথে কলবের স্বীকৃতিকে ঈমান বলে।

২. আলণ্ঢামা জুরজানি (র) বলেন–اَلْعَقَائِدُ مَا يَقْصُدُ فِيْهِ نَفْسُ الْاِعْتِقَادِ دُوْنَ الْعَمَلِ

অর্থাৎ, আকাইদ বলা হয় আমল ব্যতীত শুধু মৌলিক বিশ্বাসকে।

গ. অন্যান্য পার্থক্য

১. আকিদা সকল বিশ্বাসের সমষ্টিগত রূপ। ঈমান মানের গোপন বিশ্বাস ও আনুগত্য। আর ইসলাম হলো আকিদা ও ঈমানের আলোকে বাহ্যিক আনুগত্য। যেমন আলণ্ঢাহর বাণী– قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا

৩. عَقِيْدَةٌ হলো মানুষের ইতিবাচক বা নেতিবাচক বিশ্বাসের নাম, যা সে অন্ড়রে লালন করে। আর اِيْمَانٌ হলো আন্ড়রিক বিশ্বাসের নাম। পক্ষান্ড়রে اِسْلَامٌ হলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রকাশ্য আনুগত্য।

৪. عَقِيْدَةٌ ও اِيْمَانٌ সম্পূর্ণ বিশ্বাসগত বিষয়। আর اِسْلَامٌ হলো আমলগত বিষয়।

৫. আলণ্ঢামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি (র) বলেন– عَقِيْدَةٌ ও اِيْمَانٌ হলো- عَامٌ আর اِسْلَامٌ হলো خَاصٌّ। তাই বলা হয়– كُلُّ مُسْلِمٍ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ كُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمًا وَلٰكِنْ

৬. কেউ কেউ বলেন– عَقِيْدَةٌ ও اِيْمَانٌ শব্দদ্বয় প্রায় একই বিষয়। اِسْلَامٌ উভয়ের ব্যতিক্রম।

৭. اَلْاِيْمَانُ عَقِيْدَةٌ ও اِسْلَامٌ এ তিনটি শব্দ তা একই জায়গায় ব্যবহৃত হলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু পৃথক স্থানে ব্যবহৃত হলে একই অর্থ প্রকাশ করে।

৮. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে اِيْمَانٌ – عَقِيْدَةٌ ও اِسْلَامٌ এসব শব্দ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি থেকে অন্যটিকে আলাদা করার কোন সুযোগ নেই।

সমাপনী : ঈমান, ইসলাম ও আকিদা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ঈমান আনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আকিদা শুদ্ধ করা। আকিদা শুদ্ধ না হলে ঈমান ও আমলের ফলাফল ব্যর্থ হতে বাধ্য।

গ্রন্থপঞ্জি

১. তাহযিবুল কামাল।
২. সিয়ারু আলামিন নুবালা।
৩. তাহযিবুত তাহযিব।
৪. তাবাকাতুল হুফফায।
৫. যফরুল মুহাসসিলিন বি আহওয়ালিল মুসাননিফিন।
৬. তারিখে বাগদাদ।
৭. তাহযিবুল কামাল।
৮. কিতাবুল জারহ ওয়াত তাদিল।
৯. সিয়ারু আলামিন নুবালা।
১০. মুকাদ্দিমা ফাতহুল বারি।
১১. তাহযিবুত তাহযিব।
১২. আল ইমামুত তিরমিযি ওয়া মাকানাতুহু ফিল হাদিস।
১৩. আত তাবাকাত।
১৪. মিযানুল ইতিদাল।
১৫. কিতাবুল আসমা ওয়াল কুনা।
১৬. আল মারিফা ওয়াত তারিখ।
১৭. তাহযিবুল কামাল।
১৮. তাবকাতুল হানাফিয়্যা।
১৯. তাযকিরাতুল হুফফায।
২০. মুকাদ্দিমায়ে আকিদাতুত তহাবি।
২১. সিয়ারু আলামিন নুবালা।
২২. আল ফাওয়ায়েদুল বাহিয়্যাহ।